ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ৩০ রমযান, ১৪৩২ হিজরি | ৩১ ওয়াফা, ১৩৯০ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১১ ঈসাব্দ

عيد مبارك

ঈদ মোবারাক

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

রমযানের শেষ দশক
খোদা-মিলনের স্বাদে প্রশান্তি লাভ করুক মানবাত্মা

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে পবিত্র রমযানের রহমত ও মাগফেরাতের দিনগুলো অতিবাহিত করে আমরা প্রবেশ করেছি নাজাতের দশকে। এরও কয়েকটি দিন ইতোমধ্যে পার করে দিয়েছি। আর ক'দিন পরই আমরা ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্।

এই শেষ দশকে মহান খোদা তাআলাকে লাভ করার বিশেষ একটি রাত আসে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম আর তা হলো লাইলাতুল ক্বদর। লাইলাতুল ক্বদর এমন একটি রাত যা সর্বপ্রকার প্রাচুর্যে ভরপুর। হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট এ রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাতের কোন এক বিজোড় রাত। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করার এ এক মহা সুযোগ, কেননা আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও ক্ষমা লাভের পর এ দশকে রোযাদার আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়।

পবিত্র রমযান মাসে মহা ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে মুসলমানগণ রমযান মাসের শেষ দশ দিন ইতেকাফে বসেন, লাইলাতুল ক্বদর বা সৌভাগ্য রজনী পাওয়ার আশায়। এ বরকতময় রজনীতে সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে মু'তাকিফীন পার্থিব চিন্তা মুক্ত হয়ে নীরবে নিভৃতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে অবস্থান করে থাকেন। আর বিগলিত চিত্তে মহান স্রষ্টার সমীপে মানবের এই আত্মসমর্পণ তাঁর কৃপাকে আরও উদ্বেলিত করে তুলে। রোযাদারের মিনতিভরা আকুতি ও ব্যকুল মিলনাকাঙ্খাকে তৃপ্ত করতে উর্ধ্বালোক থেকে তিনি (আল্লাহ্) নিম্নে অবতরণ করেন, বান্দার হৃদয়-কন্দরে। প্রশান্তি লাভ হয় সমর্পিত আত্মার। খোদা-মিলনে পরিতৃপ্ত হয় সে। জাগতিক বৈধ চাহিদাগুলোর অসারতাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। প্রকৃত সুখ ও আনন্দের সন্ধান লাভ হয় তার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায়-

খোদাই আমার বেহেশ্‌ত। খোদাতেই আমার পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁর দর্শন লাভ করেছি আর সর্বপ্রকার সৌন্দর্য তাঁর মাঝে দেখতে পেয়েছি। পবিত্র রমযান শেষে নাযাতের দশকে এটাই হলো আসল প্রাপ্তি–এ কারণেই রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব।

আমরা, যারা যুগ-ইমাম'কে মান্য করে লাইলাতুল ক্বদর-এর ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করেছি, ঈদের এই আনন্দ উদযাপন আমাদের কাছে এক দাবী রাখে আর তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় ***"হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের স্মৃতিগোচর করবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং কোন ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করব যাতে শুনবার জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়।"***

উল্লেখিত এই আহ্বান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে চলছেন। তাই আল্লাহ্ তাআলার দিকে আহ্বান করার তাগিদপূর্ণ কুরআনী নির্দেশ পালনে আমরা যেন তৎপর থাকি। যেন ভুলে না যাই ঈদফান্ডে আর্থিক কুরবানী পেশ করার কথা আর সমাজের পশ্চাদপদ অংশের প্রতি সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব থেকেও যেন পিছিয়ে না পরি।

মহান খোদা তাআলার কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন শেষ দশকে তিনি রোযাদার সবাইকে তাঁর নৈকট্যের স্বাদ চাখিয়ে দিন।

সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক

mPxc Î

৩১ আগষ্ট ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
২০ মে ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ প্রদত্ত **ঈদুল ফিতরের খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১২
মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতা বক্তা: মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী উকিলে আলা তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।	১৪
হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.) মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৮
আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকারীর জন্য প্রত্যেক দিনই ঈদ মাহমুদ আহমদ সুমন	২১
ঈদ আল্লাহ্‌র শোকরানা আদায় করার নাম এনামুল হক রনী	২৩
ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়াই হোক সবার অঙ্গীকার মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৪
হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মুরিদ না হলেও তাঁর (আ.) মহান চরিত্রের সত্যায়নকারীদের ক'জন মোজাফফর আহমদ রাজু	২৫
জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৭
জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A	২৯
পাঠক কলাম	৩১
লন্ডস্থ জামেয়া হতে আগত প্রবাসী বাংলাদেশী চার জন ছাত্রের পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম	৩৩
সংবাদ	৩৪

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا
لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।

اُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآئِكُمْ ؕ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ
اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَیْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا
كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ
الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِی الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৮। রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রী-গমন তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা হলো তোমাদের পোশাক[২১২] এবং তোমরা হলে তাদের পোশাক। আল্লাহ্ জানেন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করছিলে। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন এবং তোমাদের মার্জনা[২১৩] করলেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হতে পার এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা অবলম্বন কর। আর তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়। ❶ অত:পর রাত[২১৪] (নেমে আসা) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে[২১৫] ই'তিকাফের অবস্থায় তাদের সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হবে না। এসব আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা। অতএব এর ধারে কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পারে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবং এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয় তখন তারা স্বভাবতই এ থেকে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' এ বাক্যাংশটির অর্থ এস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে,'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব 'আমার প্রতি ঈমান আনে' অর্থ এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

১১২। কী চমৎকার একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে এবং বিয়ের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এ আয়াত বলছে, বিয়ের উদ্দেশ্য হলো দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তা-ই (৭:২৭, ১৬:৮২)। বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হতে রক্ষা করা, এর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

২১৩। 'আফাল্লাহু আন্হু' এর আরো অর্থ হলো আল্লাহ্ তার ভুল সংশোধন করে তার কাজ-কর্ম ঠিক করে দিলেন, আল্লাহ্ তাকে সম্মান দিলেন। অন্য এক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাকে উদ্ধার করলেন (মুহীত)।

❶ [প্রকৃতপক্ষে সাদা রেখা ভোরের সাথে সম্পৃক্ত]। অতএব, অর্থ হবে.....'যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়'। মওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

২১৪। যেসব দিন ও রাত অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চল), সেখানে দিন ও রাত ১২ ঘন্টা করে ধরতে হবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্‌সায়াত)।

২১৫। 'ই'তিকাফ' এ থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাতে স্ত্রী-গমন কিংবা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য সব নিষিদ্ধ। কেননা রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা সাধনা করার নামই 'ইতিকাফ'।

হাদীস শরীফ

রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি"** (অর্থাৎ –হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন।

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মুবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ্ মাফ করা হয়" (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো" (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন:
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মাহ্‌দী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস এই যে, মাহ্‌দীর আগমন সংক্রান্ত এ ধরনের হাদীসসমূহ কোন মতেই আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মতে এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলি তিন শ্রেণীর বাইরে নয় ঃ (১) প্রথমত এসব হাদীস জাল, মওযূ (মনগড়া) অপ্রামাণ্য ও ভ্রান্ত এবং এদের বর্ণনাকারীদের উপর অবিশ্বস্ততা ও মিথ্যা বলার অপবাদ রয়েছে। কোন ধার্মিক মুসলমান এদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। (২) দ্বিতীয়তঃ এসব হাদীসে কিছু রয়েছে যেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) ও মযরূহ্ (যে হাদীস বর্ণনাকারীর চরিত্রের উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়) হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে এগুলো আস্থার মানদন্ডে ধোপে টেকে না। হাদীসের বিখ্যাত ইমামগণ হয় এগুলোর উল্লেখ একবারেই করেন নি অথবা আপত্তি ও অবিশ্বাস বজায়ে রেখে উল্লেখ করেছেন। তারা এ রেওয়াতের সত্যায়ন করেন নি অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেন নি। (৩) তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলোতে বিভিন্ন সনদে তাদের প্রামাণিকতার সন্ধান তো পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো হয়তো পূর্বের যুগে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ওগুলোতে বর্ণিত যুদ্ধগুলো বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর জন্য অপেক্ষার সম্ভাব্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই, অথবা এগুলোতে বাহ্যিক খিলাফত ও বাহ্যিক যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র এক মাহ্‌দী অর্থাৎ এক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন বাহ্যিক রাজত্ব ও বাহ্যিক খিলাফত হবে না। সে না যুদ্ধ করবে আর না-ই রক্ত ঝরাবে। তাঁর কোন সৈন্যদল থাকবে না। বরং আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা হৃদয়গুলিতে আবারও ঈমান প্রতিষ্ঠিত করবেন।

যেমন কিনা হাদীসে আছে 'লা মাহ্‌দীয়্যা ইল্লা ঈসা"। এটা ইবনে মাজার প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে আছে এবং হাকীম প্রণীত হাদীস গ্রন্থ 'মুসতাদরেকে' আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা মুহাম্মদ বিন খালিদ জুন্দী আবান বিন সালেহ্ হাসান বসরী হতে, হাসান বাসরী আনাস বিন মালেক হতে এবং আনাস বিন মালেক জনাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়েত করেছেন। এই হাদীসের অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যিনি ঈসার প্রকৃতি ও চরিত্রে আগমন করবেন, অন্য কেউ মাহ্‌দী হবেন না। অর্থাৎ তিনিই প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী হবেন এবং তিনিই মাহ্‌দী হবেন, যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি, চরিত্র ও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে আগমন করবেন অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলায় বল প্রয়োগ করবেন না ও যুদ্ধ করবেন না বরং পবিত্র আদর্শ ও ঐশী নিদর্শন দ্বারা হেদায়তকে বিস্তার দিবেন। এবং এই হাদীসের সমর্থনে আরেকটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে এই কথা রয়েছে, **'ইয়াযাউল হারবা'** অর্থাৎ ঐ মাহ্‌দী যার নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ তিনি ধর্মীয় যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। তাঁর এই নির্দেশ হবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো না, বরং ধর্মকে সত্যের জ্যোতিঃ নৈতিক মু'জিযা ও খোদার নৈকট্যের নিদর্শনাবলী দ্বারা বিস্তার দাও। সুতরাং আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি এ সময়ে খোদার ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছে অথবা যোদ্ধাদেরকে সমর্থন করে অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে এরূপ পরামর্শ দেয় অথবা মনে মনে এমন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে খোদা ও রাসূলের অবাধ্য এবং খোদা ও রাসূলের জরুরী বিধিবদ্ধ নির্দেশ-উপদেশ ও শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ এবং অবশ্যকরণীয় কর্তব্যসমূহের বাইরে চলে গেছে। আমি এখন আমাদের সদয় সরকারকে জানাচ্ছি যে, হেদায়াত প্রাপ্ত এবং মসীহ্ (আ.)-এর চরিত্রের উপর পরিচালিত সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমিই। প্রত্যেকের উচিত আমাকে ঐ সকল চারিত্রিক গুণাবলীর নিরিখে পরখ করে নেয়া এবং নিজ হৃদয় হতে মন্দ ধারণা দূর করা। আমার বিশ বছর ব্যাপী শিক্ষা , যা বারাহীনে আহমদীয়া হতে শুরু হয়ে 'রাযে হাকীকাত' পুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ এগুলোকে গভীরভাবে দেখে তবে ইহাকে আমার অভ্যন্তরীণ-পরিচ্ছন্নতার সব চাইতে বড় সাক্ষী হিসেবে পাবে। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে, আমি এ গ্রন্থাবলী আরব, ইউরোপ, সিরিয়া, কাবুল ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এ বিষয়কে নির্ঘাৎ অস্বীকার করি যে, ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধের জন্য মসীহ্ আকাশ হতে অবতরণ করবেন ও সে সময়ে ফাতেমার বংশধর হতে কোন ব্যক্তি মাহ্‌দী নামের বাদশাহ্ হবেন এবং দু'জনে মিলে রক্তপাত শুরু করবেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সুনিশ্চিৎ জানিয়েছেন যে, এগুলো আদৌ সঠিক নয়। হযরত মসীহ্ (আ.) বহু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাজার (সমাধি) মজুদ আছে। সুতরাং যেভাবে মসীহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া মিথ্যা প্রমাণিত সেভাবেই কোন যুদ্ধবাজ মাহ্‌দীর আগমন বাতিল সাব্যস্ত। এখন যে ব্যক্তি সত্য-পিপাসু সে যেন ইহা গ্রহণ করে।

('হাকীকাতুল মাহ্‌দী' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৭-১০)

জুমুআর খুতবা

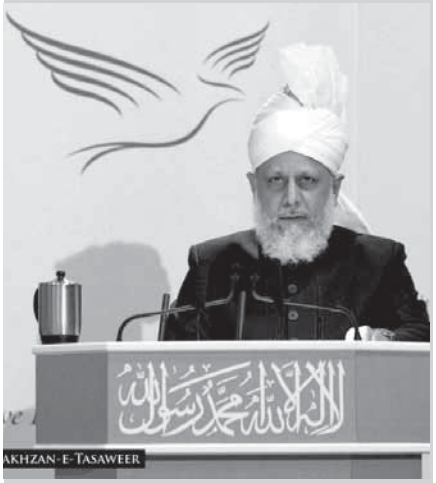

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২০ মে, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

যারা যুগ ইমামের বৈঠক হতে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন এবং 'সত্যবাদীদের সাথী হও'-কুরআন করিমের এ আদেশের উপর আমল করেছেন তারা কতইনা সৌভাগ্যবান ছিলেন।

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক, দাস, যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগত মসীহ্ ও মাহদীকে আল্লাহ্ তাআলা সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগের পর প্রেরণ করে আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলার যতই শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না কেন তা কম। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা হল, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত এ নবীর বাণী, আদেশ ও লেখাগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করুন এবং নিজেদের জীবনের অংশ বনিয়ে নিন। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করিমের সূরা তওবার ১১৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন, **"ওয়া কুনু মায়াছ সাদিকিন"** তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক।

সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে কল্যাণমন্ডিত হও। এর সুন্দরতম দৃশ্য আমরা তখন দেখতে পাই যখন দেখি, সাহাবাগণ (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তা হতে কল্যাণমন্ডিত হয়ে তাঁর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকে পরিপূর্ণ উপকৃত হয়েছেন এবং আমাদেরকে তাঁর বাণী পৌছে দিয়েছেন, সান্নিধ্যের উলেখ করেছেন ও আমাদের কাছে তাঁর উপদেশগুলো পৌছে দিয়েছেন। এটি দ্বিতীয় যুগ যাতে নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক আবির্ভূত হয়েছেন। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও কুরআন করিমের বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। পৃথিবীতে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়াই প্রমাণ করেছেন। কিন্তু নিজ সাহাবাদের (রা.) সাথে তাঁর ছোট বড় এমন অনেক বৈঠক হতো এবং বক্তৃতার আঙ্গিকে কিছু জলসা হতো যা এসব পুস্তকে নেই। যেখান থেকে তাঁর সাহাবারা (রা.) এ যুগের সত্যবাদী ও [নবী করীম (সা.)-এর] প্রকৃত দাসের বরকতময় সত্তার সংস্পর্শে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন। জামা'তের তদানীন্তন পত্রিকা এসব বৈঠকের বিবরণ সংরক্ষণ করেছে। যারা যুগ ইমামের বৈঠক হতে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন এবং 'সত্যবাদীদের সাথী হও'-কুরআন করিমের এ আদেশের উপর আমল করেছেন তারা কতইনা সৌভাগ্যবান ছিলেন। সে সব বৈঠকে বসা ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রশ্নকর্তা ব্যক্তি এবং সে সব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলোকে সংরক্ষণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা তাদের মাধ্যমে শত বছর পরেও আমরা সেসব কথা পড়তে ও শুনতে পারি। আর এগুলোকে পড়া ও শোনার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরকে কল্পনার জগতে নবী করীম (সা.)-এর প্রকৃত এ দাসের বৈঠকে বসা অনুভব করি। আজ আমি এমনই কিছু বৈঠক হতে নামায, দোয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে যেসব উপদেশ তিনি দিয়েছেন সেগুলো হতে কিছু আদেশ ও উপদেশ নিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর ১৯০৭ইং সালের জলসার একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতায় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন,

"স্মরণ রেখো- আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করিমের শুরুও করেছেন দোয়ার মাধ্যমে এবং সমাপ্তিও টেনেছেন দোয়ার মাধ্যমে। অতএব এর উদ্দেশ্য, মানুষ এতোটাই দুর্বল যে আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ছাড়া সে পবিত্র হতে পারে না এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত সে পুণ্যকর্মে উন্নতিও করতে পারে না। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

আল্লাহ্ যাকে জীবিত করেন সে ছাড়া সবাই মৃত, আর আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে ছাড়া সবাই পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহ্ যাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন সে ছাড়া আর সবাই অন্ধ। প্রকৃত কথাটি হল, আল্লাহ্ তাআলার কৃপা লাভ না করা পর্য ন্ত পার্থিব ভালবাসার বেড়ি গলার মালা হয়ে থাকে। জাগতিক ভালবাসার এ ফাঁদ গলায় আটকে থাকে।"

(মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২, লন্ডন এডিশন ১৯৮৪ইং)

সে ব্যক্তিই এ থেকে মুক্তি পায় যার উপর আল্লাহ্ কৃপা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তাআলার কৃপাও দোয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়। কল্যাণ লাভ করতে চাইলে তা দোয়ার মাধ্যমেই প্রার্থনা কর।

নামাযের মধ্যে কুচিন্তা দূর করার প্রতি জোরালো তাগিদ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এ দোয়া কি? মুখে তো বল, **ইহ্ দীনা সিরাতাল মুস্তাকীম** (অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে সহজ সরল ও সুদৃঢ় পথ দেখাও) আর মনের মাঝে চিন্তা থাকে, অমুক ব্যবসাটা এভাবে করব, তমুক জিনিসটি রয়ে গেছে, এ কাজটি এভাবে করা উচিত ছিল, এমন হলে এমন করব, এটা তো আসলে শুধু বয়স নষ্ট করা মাত্র। কুরআন করীমকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত এবং সে অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত মানুষের নামায শুধু তার সময় নষ্ট করার নামান্তর।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৬২-৬৩, ঐ)

এজন্যও তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

একটি ঘটনা রয়েছে [এ ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন]- "এক বুযূর্গ কোন একটি মসজিদে যান, সেখানকার ইমামুস্ সালাত নামায পড়ানোর সময় তার ব্যবসার বিষয়ে চিন্তা করছিলেন যে, আমি এ মাল অমৃতসর থেকে কিনে দিলি নিয়ে যাব সেখানে এত লাভ করব, পরে কোলকাতা নিয়ে যাব সেখান থেকে এত লাভ করব এবং পরে আরো এগিয়ে যেতে থাকব। এক বুযূর্গ নামায পড়ছিলেন তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা ভাবে নামায পড়া শুরু করেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে কাশফি অবস্থায় সেই ইমামের মনের অবস্থা জানিয়ে দেন। পরে সাধারণ নামাযিরা অভিযোগ করে, হে মৌলভী সাহেব! এ ব্যক্তি আপনার পিছনে নামায পড়ে নি বরং (আপনার পিছন থেকে) সে নামায ছেড়ে দিয়েছে। তিনি (অর্থাৎ মৌলভী সাহেব) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, বলুন-কি কারণ? আপনি নামায ছেড়েছেন কেন? এটা কত বড় পাপ জানেন? তিনি উত্তরে বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ। আপনি অমৃতসর থেকে সফর শুরু করে কোলকাতা চলে গেছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বুখারা চলে যাচ্ছিলেন, আমি তো আপনার সাথে এতো দূর যেতে পারি না।"

কোন কোন সময় নামাযির এ অবস্থাও হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ইং সালে একটি বক্তৃতায় বলেন, "নামায কি? এটি একটি দোয়া যাতে বেদনা ও জ্বালা থাকে। এ জন্য এর নাম 'সালাত' কেননা জ্বলন, বিরহ ও বেদনার সাথে প্রার্থনা করা হয়, আল্লাহ্ তাআলা যেন কু-ইচ্ছা ও মন্দ আবেগ অনুভূতিগুলোকে ভিতর থেকে দূর করে দেন এবং তাঁর সার্বজনীন কৃপার অধিনে তিনি যেন সেই স্থানে পবিত্র ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।"

'সালাত' শব্দটি এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, শুধু বাক্য ও প্রাণহীন দোয়া যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে এক প্রকার জ্বলন, আকুতি মিনতী ও বেদনা থাকা আবশ্যক। দোয়াকারী মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা কোন দোয়া কবুল করেন না। দোয়া করা একটি কঠিন কাজ। মানুষ এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। অনেকেই আমার কাছে চিঠি লিখে, আমি অমুক সময় অমুক কাজের জন্য দোয়া করেছিলাম কিন্তু এর কোন ফল হয় নি। এভাবে তারা আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষণ করে এবং নিরাশ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

"তারা জানে না, দোয়ার সাথে এর আবশ্যক বিষয়গুলো না থাকা পর্যন্ত দোয়ার মাধ্যমে কোন উপকার পাওয়া যায় না। দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়টি হল, হৃদয় যেন বিগলিত হয় এবং আত্মা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে পানির মত প্রবাহিত হয়। আর এতে যেন এক প্রকার আকুতি মিনতি সৃষ্টি হয় এবং এর সাথে সাথে মানুষ যেন ধৈর্যহীন না হয় আর তাড়াহুড়া না করে। বরং সে যেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দোয়া করতে থাকে। এমন হলে আশা করা যায়, সেই দোয়া গৃহীত হবে। নামায অত্যন্ত উচ্চস্তরের দোয়া কিন্তু পরিতাপ, মানুষ এর মূল্যায়ন করতে জানে না। এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে মনে করে, প্রথাগত ভাবে কিয়াম, রুকু ও সিজদা করা এবং বুঝে বা না বুঝে তোতার মত কিছু বাক্য আওড়ালেই চলে।"

হুযূর (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! আমাদের এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষির জন্য নামাযের মত এমন নেয়ামত থাকার পর নতুন আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। নবী করীম (সা.) যখনই কোন কষ্ট ও বিপদাপদ দেখতে পেতেন তখনই তিনি নামায পড়তে দাড়িয়ে যেতেন। আমাদের আপনজন এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের অভিজ্ঞতা হল, নামায ছাড়া অন্য কোন জিনিস মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। মানুষ যখন কিয়াম করে তখন সে এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করে এবং একজন দাস যখন তার প্রভূর সামনে দাড়ায় তখন সে সর্বদাই হাত বাঁধা অবস্থায় দাড়ায়। রুকুও এক ধরণের সম্মান প্রদর্শন আর এটা কিয়ামের চেয়েও উচ্চতর সম্মান প্রদর্শন এবং সেজদা তো সম্মান প্রদর্শনের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষ যখন নিজেকে বিলীন করে ফেলে তখন সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। পরিতাপ সেসব অজ্ঞ ও জাগতিক বিষয়ে বিভোর ব্যক্তিদের জন্য যারা নামায সংশোধন করতে চায় এবং রুকূ সিজদার বিষয়ে আপত্তি করে। এটা তো সর্বোচ্চ গুণের কথা। নামায সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। মানুষ সেই জগতের অংশীদার না হওয়া পর্যন্ত মানুষের হাতে কিছুই থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে না সে নামাযের উপর কিভাবে বিশ্বাস করতে পারে?"

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,১০৯-১১০)

হুযূর (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলার কাছে ব্যাথাতুর হৃদয়ে এবং এক ধরণের উদ্দীপনার সাথে দোয়া করা উচিত, (হে আল্লাহ্) যেভাবে তুমি বিভিন্ন ফুল ও জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রং ও স্বাদ দান করেছ ঠিক সেভাবে একবার নামায ও ইবাদতের স্বাদ চাখিয়ে দাও। কোন জিনিস খেতে পারলে, স্মরণ থাকে। দেখুন! কোন মানুষ যদি কোন একটি সুন্দর জিনিসকে আনন্দ সহকারে দেখে তবে সেটাকে অনেক বেশি মনে রাখে। কেউ যদি কোন কুশ্রী ও অপছন্দনীয় চেহারা একবার দেখে, তবে সেটার বিপরীতে এর পূর্ণ অবয়ব সশরীরে তার স্মৃতির সম্মুখে চলে আসে। তবে হ্যাঁ! যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তবে কিছুই মনে থাকে না। একই ভাবে বে-নামাযীর কাছে নামায একটি দন্ড মাত্র। কেননা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডার মাঝে ওযূ করে, আরামের ঘুম ছেড়ে এবং আরো কিছু আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে (এ নামায) পড়তে হয়। মূলকথা সে অসন্তুষ্ট। সে এটাকে বুঝতে পারে না। নামাযের মধ্যে যে সুখ ও মজা রয়েছে সে বিষয়ে সে অবগত নয়। অতএব, সে কিভাবে নামাযে মজা পাবে?"

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ইং সালের একটি বৈঠকে দোয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "দোয়ার ব্যাপারে হযরত ঈসা (আ.) উত্তম উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একজন কাজী ছিলেন। যিনি কারো সাথে ন্যায় বিচার করতেন না এবং দিবারাত্রি কেবল নিজের আরাম আয়েশের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন। এক মহিলার একটি মামলা ছিল, কাজেই সে প্রতিদিন তার কাছে আসত এবং ন্যায়বিচার প্রার্থনা করত। সে বারবার এমন করতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত কাজী অতিষ্ঠ হয়ে ন্যায় বিচার করার মাধ্যমে সেই মহিলার পক্ষে রায় ঘোষণা দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন, দেখো- তোমাদের খোদা কি কাজীর মতোও নয়, যিনি তোমাদের দোয়া শুনবেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দিবেন? অবিচল থেকে দোয়া করতে থাকা উচিত। দোয়া গৃহীত হওয়ার সময় অবশ্যই আসবে। শর্ত হল, অবিচল থাকতে হবে।

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৪১)

অন্য এক বৈঠকে বলেছেন, দেখো! নামাযকে প্রথাসর্বস্ব ভাবে পড়লে কোন লাভ নেই। বরং তাদের নামায গৃহীত হওয়া তো দূরের কথা এমন নামাযের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা অভিসম্পাত এবং ধ্বংসের বার্তা পাঠিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ফাওয়াই লুল্লিল মুছাল্লিন"** এ কথা সেই সব নামাযী সম্বন্ধে যারা এর নিগুঢ় তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। সাহাবাগণ (রা.) তো নিজেরাই আরবি ভাষা জানতেন, এর প্রকৃত তত্ত্ব খুব ভালভাবে বুঝতেন। কিন্তু আমাদের জন্য এটা খুব জরুরী আমরা যেন এর অর্থ জানি এবং এভাবে আমাদের নামাযের মাঝে মাধুর্য্য সৃষ্টি করি। কিন্তু এসব লোক যেন মনে করে নিয়েছে অপর এক নবী আসবেন আর তিনি নামায রহিত করবেন। অর্থাৎ নামায বুঝার পরিবর্তে নামাযকে তারা এমন বানিয়ে নিয়েছে যে শুধু প্রথাগত উপাচারগুলো রয়েগেছে। যেন নতুন আদেশ জারি হয়েছে এবং নতুন কোন নবী আদেশ জারি করেছেন। হুযূর (আ.) বলেন, দেখো! এতে আল্লাহ্ তাআলার কোন লাভ নেই। বরং এতে মানুষের জন্যই মঙ্গল রয়েছে, তাকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়, আবেদন নিবেদনের মর্যাদা দেয়া হয় যার মাধ্যমে সে অনেক ধরণের বিপদাপদ হতে রক্ষা পায়। একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হই যে, এসব লোক কিভাবে জীবনযাপন করে, যাদের দিনও কেটে যায় আর রাতও কেটে যায় কিন্তু তারা জানে না তাদের কোন প্রভূ আছেন। স্মরণ রেখো! এমন লোকেরা আজও ধ্বংস হয়েছে আর কালও হবে। হুযূর (আ.) বলেন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি- হায়! মানুষ যদি মনে রাখত! দেখো! আয়ুষ্কাল কমে যাচ্ছে। উদাসীনতা পরিত্যাগ কর এবং আকুতি মিনতী অবলম্বন কর। নির্জনে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া কর, আল্লাহ্ তাআলা যেন ঈমানকে নিরাপদ রাখেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি হন।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা,৪১২-৪১৩)

১৯০৭ইং সালের মার্চ মাসের একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন। সেখানে দুই বন্ধুর মাঝে মনোমালিন্য হয়। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন উপদেশ দেন। তিনি আরো বলেন, হৃদয় পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত দোয়া গৃহীত হয় না। জাগতিক বিষয়ে এক জনের প্রতিও যদি তোমার মনে কোন বিদ্বেষ থাকে তাহলে দোয়া গৃহীত হবে না।

তিনি আরো বলেন, পারস্পারিক ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য এবং মিথ্যা অহংকার বশতঃ একজনের প্রতি অন্যজনের অসন্তুষ্টি- এ সব পরিত্যাগ কর। হিংসা বিদ্বেষ দূর কর। কেননা হৃদয় হিংসা বিদ্বেষে ভরা থাকলে তোমার দোয়া কবুল হবে না। এ কথাটি খুব ভাল ভাবে স্মরণ রাখা উচিত, জাগতিক কারণে কখনোই কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। জগত ও এর উপকরণ সামগ্রী কী মর্যাদা রাখে যার জন্য তুমি অন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবে?

(মালফুযাত ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা,২১৭-১১৮)

হুযূর (আ.) প্রতি দিন সকালে প্রাত ভ্রমনে বের হতেন, সাহাবায়ে কেরামও তাঁর সাথে থাকতেন। কোন না কোন বিষয়ে আলোচনা চলতেই থাকত। ১৯০৮ইং সালের এক সকালের প্রাতভ্রমনের উলেখ আছে। (এ আলোচনাটি অনেক বড় ছিল, আমি এর একটি অংশ নিয়েছি)

"কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যে, তারা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়, এসব কথা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। যতই উপদেশ দেই না কেন তাদের উপর প্রভাব পড়ে না। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তাআলা একেবারে মুখাপেক্ষি নন। বিগলিত চিত্তে অধিক হারে ও বার বার দোয়া না করা পর্যন্ত তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখো! কারো স্ত্রী-সন্তান অসুস্থ্য হলে বা কারো বিরুদ্ধে জোরালো মামলা হলে এসব বিষয়ে তার মাঝে কেমন ব্যাকুলতা থাকে? অতএব, দোয়ার মাঝে প্রকৃত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটি পুরোপুরি প্রভাবশূণ্য ও বৃথা কাজ মাত্র। দোয়া কবুলের জন্য ব্যাকুলতা শর্ত, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

অর্থাৎ, যখন কেউ দোয়া করে তখন কে তার দোয়া শুনেন এবং দুঃখ কষ্ট দূর করে দেন। তিনি অসহায় ও ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন। পরে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলাই তার দোয়া শুনে থাকেন।"

(মালফুযাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৭)

লাহোরের এক বৈঠকে অ-আহমদী বন্ধুরাও ছিল। এ বৈঠকে তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন যাতে তিনি দোয়া সম্বন্ধে বলেন, "ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির অনুগত করে।" হুযূর (আ.) বলেন, "কিন্তু সত্য কথা হল, মানুষ তার গায়ের জোরে এ অবস্থান পায় না। তবে হ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের জন্য সাধনা করা ফরয। কিন্তু এই মর্যাদা লাভের প্রকৃত উপায় দোয়া। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল, সে দোয়ার মাধ্যমে ঐশী শক্তি ও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এই দূর্গম পথ পাড়ি দিতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **খুলিকাল ইনসানু যায়িফা** অর্থাৎ মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এমন দূর্বলতা নিয়ে নিজ শক্তিতে এতো বড় উচ্চমর্যাদা লাভের দাবি করা খামখেয়ালী ছাড়া কিছুই না। সুতরাং দোয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

দোয়া একটি বিরাট শক্তি যদ্বারা অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। অত্যন্ত দূর্গম গন্তব্যে সহজে উপনীত হওয়া যায়। কারণ দোয়া সেই কল্যাণ ও শক্তিকে আকৃষ্ট করার প্রস্রবণ যা খোদা তা'লার কাছ থেকে উৎসারিত হয়ে আসে। যে ব্যক্তি বেশি বেশি দোয়ায় রত থাকে সে অবশেষে এই কল্যাণধারা লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ কেবল দোয়া চান না বরং সকল প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমও করতে হবে, অনেক চেষ্টা করবে, সাথে সাথে অনেক দোয়াও করবে। বাহ্যিক উপকরণ সমূহকে কাজে লাগাবে। উপকরণকে ব্যবহার না করে কেবল দোয়া করা- এটি দোয়ার নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং খোদা তাআলাকে পরীক্ষা করা মাত্র। একই ভাবে কেবল উপকরণ সমূহ ব্যবহার করা এবং দোয়াকে গুরুত্ব না দেয়াটা নাস্তিকতা।

অতএব নিশ্চয়ই জেনে রেখো, দোয়া একটা বিরাট সম্পদ। যে ব্যক্তি দোয়াকে পরিত্যাগ করে না তার ইহকাল ও পরকালের কোনটাই নষ্ট হবে না। সে এমন এক দূর্গে নিরাপদে আছে যার চারপাশে সব সময় সশস্ত্র প্রহরী পাহাড়া দিচ্ছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দোয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না তার অবস্থা এমন যে, সে নিরস্ত্র খালি হাত, দুর্বল ও এমন জঙ্গলের মাঝে সে অবস্থান করছে যেখানে হিংস্র ও ভয়ংকর পশুতে পরিপূর্ণ। সে বুঝতে পারে যে, সে কোন ভাবেই সেখানে নিরাপদ নয়। যেকোন মুহূর্তে সে ভয়ংকর পশুর আক্রমনের শিকার হতে পারে। যখন তার হাড়গোড়েরও দেখা পাওয়া যাবে না। অতএব স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি জানে যে তার আসল নিরাপত্তা দোয়ার মাঝে, সে ভাগ্যবান। সে দোয়ায় রত থাকলে এই দোয়া-ই তার জন্য আশ্রয়স্থল। (মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩)

লাহোরের একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

চরিত্র সংশোধনের মূল কথা হল, দোয়ার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ভালবাসা অর্জন করতে হবে। নিজের চরিত্র সংশোধন কর, তারপর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পবিত্র ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর। সব ধরণের পাপ এবং মন্দ কাজ হতে দূরে থাক। এমন অবস্থা হওয়া চাই যে অভ্যন্তরীণ যত দোষ-ত্রুটি আছে সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ এক ফোটা পানির মত হয়ে যাও। এমন অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিপদ। তবে দোয়ার সাথে চেষ্টা তদবীরকে বাদ দিবে না। কেননা আল্লাহ্ চেষ্টা তদবীর করা পছন্দ করেন। এজন্যই **"ফালমুদাব্বি রাতি আম্‌রা"** বলে কুরআন শরীফে কসম খাওয়া হয়েছে। যখন সে এ স্তর অতিক্রম করতে দোয়াও করবে, চেষ্টা তদবীরও করবে, অবস্থান, সহ-অবস্থান এবং সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধাগুলোকে দূর করে দিবে, তারপর প্রথাসর্বস্ব ভাব এবং কৃত্রিমতা হতে পৃথক হয়ে দোয়ায় রত থাকবে। এ অবস্থায় একদিন সে কবুলিয়্যতের লক্ষন প্রত্যক্ষ করবে। এটা মানুষের ভুল যে, সে কিছুদিন দোয়ারত থাকার পর থেমে যায়, অগ্রসর হয় না আর অভিযোগ করে যে, আমরা দোয়া তো করেছি কিন্তু কবুল হয়নি। অথচ সে দোয়ার জন্য যা যা করণীয় ছিল তা করেনি। এভাবে কি করে দোয়া কবুল হবে? একজনের ক্ষুধা বা খুব পিপাসা লেগেছে এখন যদি সে একটি দানা বা এক ফোটা পানি গ্রহণ করে তবে কিভাবে তার পেট ভরবে? এ অবস্থায় অভিযোগ কি যথার্থ হবে? অবশ্যই না। যতক্ষণ সে যথেষ্ট পরিমান খাদ্য গ্রহন না করবে বা পানি পান না করবে ততক্ষণ কোন উপকার হবে না। দোয়ার অবস্থাও এমনই। মানুষ যদি দোয়ার সাথে লেগে থাকে, দোয়ার নিয়ম কানুন মেনে চলে তবে এক সময় আসবে যখন সে সফল হবে। কিন্তু মাঝ পথেই যদি সে দোয়া করা বন্ধ করে দেয় তবে– কত মানুষ মারা গেছে, বিপথগামী হয়েছে আরও কত আর ভবিষ্যতেও শত শত মানুষ মরতে প্রস্তুত। (মাঝপথে যদি ছেড়ে দাও তবে মরতে প্রস্তুত থাক)

হুযূর (আ.) বলেছেন, অনুরুপভাবে মানুষ সব ধরণের মন্দকর্মে আপাদমস্তক ডুবে আছে। এমন অবস্থায় কয়েকদিনের দোয়া কি প্রভাব ফেলতে পারে? অর্থাৎ রাত-দিন মন্দ কাজ বা কুচিন্তায় মগ্ন থাকলে দুই চার মিনিটের দোয়ায় কী আর লাভ হবে?

তারপর স্বেচ্ছাচারিতা, অহংকার, লোকদেখানো ইত্যাদি এমন সব রোগ লেগে আছে যা নিজের ভাল কাজগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পুণ্য কর্মের উপমা একটি পাখির ন্যায়, ঠিকমত খাঁচায় বন্দী রাখলে সে থাকবে নয়তো উড়ে চলে যাবে। তবে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এটি লাভ করা যায় না। আল্লাহ্ বলেছেন,

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতে অন্য কাউকে যেন শরিক না করে। (সূরা আল কাহাফ-১১২) এখানে সৎকর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে এর সাথে যেন কোন প্রকার পাপের সংমিশ্রন না ঘটে। স্বচ্ছতার পর যেন আরো স্বচ্ছতা থাকে। না স্বেচ্ছাচারিতা, না অহংকার না গর্ববোধ আর না কোন প্রকার নাফসে আম্মারার মিশ্রন আর না অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা বা আশা করা, এমনকি জাহান্নাম বা জান্নাতের লোভ করা যেন না হয় বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের জন্য কর্ম সম্পাদন করা।

যতক্ষণ অন্য কোন আশা-আকাঙ্খা থাকবে ততক্ষণ হোঁচট খাবে আর এটাই শির্ক। কারণ এমন বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন্ কাজে আসবে? যার পেছনে এক কাপ চা বা অন্য কোন পছন্দ রয়েছে। এমন মানুষ যেদিন এতে ব্যতিক্রম দেখবে সেদিনই সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যারা সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে বা সন্তান লাভের আশায় অথবা অমুক অমুক বিষয়ে সাফল্য লাভের আশায় খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় এদের সেই সম্পর্ক সাময়িক। এদের ঈমানও বিপদের মাঝে থাকে। যেদিন তার উদ্দেশ্য সফল হবে না অথবা মনবাসনা পূর্ণ হবে না সেদিনই তার ঈমানে ফাটল দেখা দেবে। অতএব প্রকৃত মু'মিন হল সে, যে কোন কিছুর লোভ না করে ইবাদত করে। সে এজন্য ইবাদত করে না যে এটা করলে লাভ হবে তাই ইবাদত করব।

১৯০৪ইং সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক মজলিসে হযরত আকদাস (আ.) বলেন,

অনেকে আছে যারা মুখে বলেন, আমরা খোদার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখ তবে দেখবে, তাদের মাঝে নাস্তিকতা বিরাজ করছে। কারণ যখন তারা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তারা খোদার গযব ও মহিমার কথা ভুলে যায়। এজন্যই দোয়ার মাধ্যমে খোদা তাআলার মাগফেরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া কখনই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করা যায় না। এটা তখনই অর্জন হবে যখন সে জানবে, খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার অর্থ হল এক প্রকার মৃত্যু।

পাপ মুক্ত হওয়ার জন্য যখন দোয়া করবে তখন এথেকে যেন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাদ না পরে। পাপমুক্ত হতে দোয়াও করতে থাক আর সাথে সাথে চেষ্টাও করতে থাক। এমন সব মাহ্‌ফীল বা মজলিসে যোগ দেয়া হতে বিরত থাক যেখানে পাপের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়। (এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষকরে যুবসমাজের জন্য। তারা যেন এমন মাহফীল বা মজলিসে যোগ না দেয় যেখানে মন্দ ও অসামাজিক কার্জকলাপ হয়।) সাথে সাথে দোয়াও করে যেতে হবে। খুব ভালভাবে মনে রাখবে, এমন সব বিপদাপদ যা মানুষের সাথে প্রাকৃতিক ভাবে যুক্ত হয় তা থেকে নিরাপদ হওয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্ভব না।

পাঁচ ওয়াকতের নামায যা আদায় করা হয় এর মাঝেও এদিকে ইংগিত রয়েছে, নামাযকে যদি আবেগ আর বাজে চিন্তা থেকে বিশুদ্ধ না করা হয় তবে সঠিক নামায হবে না। অবশ্যই নামায অর্থ কেবল উঠাবসা এবং মাটিতে মাথা ঠোকার নাম নয়।

নামায এমন জিনিস যার মাধ্যমে মানুষ যেন অনুভব করে, তার আত্মা বিগলিত হয়ে মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে নিপতিত হচ্ছে। যতদূর সম্ভব বিগলিত চিত্তে নামায পড়তে হবে। অত্যন্ত মর্মাহত চিত্তে দোয়া করতে হবে যেন অভ্যন্তরীণ অহংকার ও পাপ পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়। এমন নামাযই মঙ্গল

বয়ে আনে। আর যদি কেউ এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে অর্থাৎ সব সময়ই এমন নামায পড়তে পারে তবে দেখবে দিন বা রাত যে কোন সময় তার অন্তরে একটি নূর (আলো) এসে প্রবেশ করবে এবং তার নফসে আম্মারার ঔদ্ধত্য দূর্বল হয়ে পড়ছে। সাপের মধ্যে যেমন ভয়ানক বিষ থাকে তেমন নফসে আম্মারাও প্রাণবিনাশী বিষ-ই বটে। যিনি একে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছেই এর মহৌষধ আছে। (অর্থাৎ একে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। যত ধরণের পাপ এবং ক্ষতিকর জিনিস আছে এসবের চিকিৎসাও আল্লাহ্‌র কাছে চাও। তবে তা হতে হবে, খাঁটি অন্তরের চেষ্টা।) (মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩)

১৯০৪ইং সালের অপর এক বৈঠকে হযরত আকদাস (আ.) এক বক্তব্য দিয়েছিলেন যেখানে নতুন বয়আতকারীরা উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আ.) বলেন, দোয়ার বিষয়ে মানুষের নিজের মাঝে ডুব দিয়ে দেখা উচিত যে, দোয়ার মাঝে সে কোন দিকে ঝুঁকে পড়ছে। জগৎ-সংসারের প্রতি সে ঝুঁকছে না কি ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। অর্থাৎ বেশি দোয়া সে সাংসারিক আরাম আয়েশের জন্য করছে না কি রূহানী বা ধর্মের সেবার জন্য করছে? এটি অবশ্যই লক্ষনীয় বিষয়। তোমরা তোমাদের নিজের মাঝে উঁকি দিয়ে লক্ষ্য কর, তোমাদের মনোযোগ কোন দিকে, সংসারের দিকে না কি ধর্মের দিকে? আর এর মান-ই বা কী? তোমরা যে সমস্ত দোয়া কর তার কতটা দোয়া ইহকালের সুখ-সুবিধার জন্য আর কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ধর্মের সেবার জন্য। যদি দেখ, উঠতে বসতে, শয়ন-জাগরনে সারাক্ষণ শুধু সংসার জীবনের চিন্তা তাহলে তার কাঁদা উচিত।

অনেক সময় দেখা গেছে, মানুষ কোমর বেঁধে সাংসারিক উন্নতির জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করছে। দোয়ায় রত হয়েছে, ফলাফল হল বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু যদি ধর্মের জন্য এমন হয় তবে আল্লাহ্ কখনই তাকে ব্যর্থ করবেন না। কথা ও কাজের উদাহরণ একটি শষ্যদানার সাথে দেয়া যায়। কাউকে যদি একটি বীজ দেয়া হয় আর সে এটা নিয়ে ফেলে রাখে ব্যবহার না করে তবে সেটা পড়ে পড়ে নষ্ট হবে বা ঘুনে খেয়ে ফেলবে। অনুরুপভাবে মুখের কথা অনুযায়ী যদি আমল করা না হয় তবে কথাই রয়ে যাবে। অতএব, আমল হওয়া চাই। (মটিতে বীজ বপণ করে অঙ্কুরোদগম হতে দিলে তা চারা হবে এবং পরে তা গাছে পরিনত হবে। ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে।)

(মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭)

১৯০৮ইং সালের এক বৈঠকে হযরত আকদাস (আ.) বললেন,

প্রকৃত দোয়া কী ? দোয়া দু-রকম হতে পারে। (১) সাধারন দোয়া। (২) বিশেষ দোয়া, যে দোয়া মানুষ শেষ পর্যন্ত করতে থাকে। অতএব, এটাই আসল দোয়া। মানুষের উচিত কোন সংকটে না পড়েও দোয়া করতে থাকা। (বিষয়টি এমন যে, বিপদে আপতিত হলেও দোয়া করবে আর না হলেও দোয়া করবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও দোয়া করবে।) কারণ সে জানে না যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কী? আগামী কাল কি হবে? অতএব, পূর্বেই দোয়া কর যেন রক্ষা পাও। অনেক সময় এমনভাবে বিপদ আপতিত হয় যে দোয়া করার সুযোগই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বেই যদি দোয়া করা হয় তবে বিপদের সময় ঐ দোয়ার সুফল পাওয়া যায়। এটি দোয়ার গুরুত্ব। (মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২)

অপর এক বক্তৃতায় হুযূর (আ.) বলেন, মানুষের অবয়ব, আকার আকৃতি, দুইহাত, দুই পা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়। অথচ মানুষ এ দৃশ্য দেখেও কত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে **"ওয়াতা আনু আলাল বির্‌রে ওয়াত্ তাক্‌ওয়া"** অর্থাৎ তোমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগীতা কর– কথাটি বুঝে না। অর্থাৎ মানব শরীরের গঠন– তার অঙ্গ প্রতঙ্গ, হাত-পা পরস্পরের সহযোগীতা করে, এমন করেই বানানো হয়েছে। অনুরুপভাবে বুঝতে হবে যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমরা একে অপরের সাহায্য কর, এর অর্থ কি? তবে হ্যাঁ, আমি বলব উপকরণ সংগ্রহের জন্যেও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য নাও।

অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে জাগতিক উপকরণ সংগ্রহের জন্যও দোয়া কর। পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতার ব্যাপারে আমি মনে করি না যে, যখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র এই ব্যবস্থার কথা বলছি তখন তোমরা আমার কথাকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ তাআলা এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দেখানোর জন্যই আম্বীয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ছিলেন এবং আছেন, তিনি চাইলে পৃথিবীতে আম্বীয়ায়ে কেরামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা রাখতেন না।

কিন্তু তবুও এক সময় আসে যখন আম্বীয়ায়ে কেরাম বলেন, **"মান আনসারী ইলাল্লাহ্"**-'কে আছে যে আল্লাহ্‌র খাতিরে আমাকে সাহায্য করবে?' তাঁরা এ কথা কি সেই ভিখারির মত বলেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? তাঁদের এমন, "মান আনসারী" বলারও বিশেষ এক মর্যাদা আছে। এভাবে তারা বিশ্ববাসীকে শিখাতে চান যে, এ জগতে উপকরণকে কাজে লাগানোরও প্রয়োজন আছে।

আম্বীয়ায়ে কেরাম যখন ঘোষণা করেন, 'মান আনসারী'-কে আমার সাহায্য করবে? তখনও মূলত: তাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না। তাঁরা জগতকে শেখাতে চান যে জাগতিক উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। এটা দোয়ারই একটা দিক। নতুবা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ ভরসা থাকে।

আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি তারা সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। তারা জানেন যে, আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, যেমন

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা এ জগতে আমাদের রাসূলগণকে সাহায্য করে থাকি এবং যারা ঈমান আনে তারা সাহায্য করে থাকে। এটি একটি সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি যা অবশ্যই পুরণ হবে। আমি বলেছি, আল্লাহ্ যদি কারো অন্তরে রাসূলকে সাহায্য করার প্রেরণা না দেন তবে কিভাবে কেউ রাসূলকে সাহায্য করে? আসল কথা হল, প্রকৃত সাহায্যকারী ও সহায়ক তিনিই যাঁর সমস্ত গৌরব। **"নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মাল ওয়াকিলু ওয়া নি'মান নাসির"** অর্থাৎ তিনিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এবং সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। পৃথিবী ও পার্থিব সাহায্য তাঁদের সামনে মৃত বস্তুর ন্যায়। এসব সাহায্য মৃত কীট-পতঙ্গের সমানও হয় না। কিন্তু জগদ্বাসীকে দোয়ার একটা মোটা পদ্ধতি বলার জন্য তারা এ পথ বেছে নেন। নয়ত তাঁরা তাঁদের কাজ কর্মের জন্য আল্লাহ্‌কেই সবচেয়ে বড় ত্রানকর্তা জ্ঞান করেন। আর এটাই সত্য কথা। **"ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ সালিহিন"** অর্থাৎ এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আল আ'রাফ ১৯৭) সৎকর্মশীলদেরকে

তিনিই নিযুক্ত করেন। এবং তাঁরই কর্ম অন্যদের দ্বারা প্রকাশ করেন।

আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সাহায্যের জন্য বক্তৃতা করতেন।

এটি বড়ই লক্ষ্যনীয় বিষয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ প্রেরিতগণ মানুষের কাছে সাহায্য চান না। বরং **'মান আনসারী ইলাল্লাহে'** বলে তাঁরা সে সব ঐশী সাহায্যকে স্বাগত জানাতে চান এবং অত্যন্ত উচ্ছসিত আবেগে আপুত হয়ে ঐশী সাহায্য অন্বেষণ করেন। নির্বোধ লোকেরা মনে করে তাঁরা (নবীরা) মানুষের সাহায্য চান। বরং এভাবে সেই মর্যদাপূর্ণ অবস্থানে থেকে কোন কোন হৃদয়ের জন্য সাহায্য এবং কল্যাণ ও রহমতের কারণ হন।

সূতরাং আল্লাহ্ প্রেরিতগণ যে সাহায্যের আবেদন করেন এটাই হল সেই রহস্য এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নবীগণ অন্যদের কাছে কেন সাহায্য চান? নিজ কর্তব্য পালনের খাতিরে মানুষের মনে যেন খোদার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। নয়তো একথা তো প্রায় কাফের বানানোর পর্যায়ে পরে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা কর। সেই শ্রেণীর পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। (মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, দোয়ার উদাহরণ একটি সুপেয় পানির ঝর্ণার মত যার কিনারায় সে বসে আছে। সে যখন ইচ্ছা সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে নিজকে সিক্ত করতে পারে। মাছ যেভাবে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। একই ভাবে একজন মুমিনের জন্য সেই পানি হল তার দোয়া যাকে বাদ দিয়ে সে বাঁচতে পারে না। দোয়ার সঠিক সময় নামায, যার মাঝে মুমিন আনন্দ অনুভব করে। এটি এমন আনন্দ যে, কোন পাপীর সবচেয়ে আনন্দপ্রদ পাপকর্মও এর কাছে তুচ্ছ।

দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি লাভ হয় তা হল আল্লাহ্‌র নৈকট্য। দোয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র খুব কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে নিজের দিকে আকর্ষন করেন। যখন কোন মুমিন দোয়ার মাঝে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি সদয় হন এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। মানুষ যদি নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সে দেখবে, আল্লাহ্ যার অভিভাবক না হন তার জীবনধারন প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। একটু চিন্তা করে দেখুন, মানুষ যখন সাবালক হয়, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারে, তখন বিভিন্ন রকম ব্যর্থতা, বিভিন্ন প্রকার পরাজয় ও বিপদাপদ শুরু হয়ে যায় এবং সে এসব থেকে মুক্তি পেতে বহু চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে থাকে।

সম্পদ, প্রশাসন ও নানা ধরনের চালাকীর মাধ্যমে সে চেষ্টা করতে থাকে। (পৃথিবীতে যখন বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ আসতে শুরু করে তখন সে কত কি না করে! ধনদৌলত থাকলে তা সে কাজে লাগায়, বড় কোন কর্মকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকলে সে তা কাজে লাগায় অথবা বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা প্রচেষ্টা, ধোকাবাজি বা অন্য কোন উপায়ে) সে বাঁচার পথ খুঁজে। কিন্তু তার জন্য সফলতা খুব কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় সেই তিক্ত কর্মের পরিনামে আত্মহত্যাও ঘটে যায়। এখন যদি সংসারে ডুবে থাকা এসব মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দুর্দশার তুলনা আহলুলাহ্ (আল্লাহ্ ওয়ালা) বা আম্বিয়ায়ে কেরামের বিপদাপদের সাথে করা হয় তবে আম্বিয়া কেরামের বিপদাপদ বা সংকট সংসারে বিভোর সেই মানুষের তুলানায় খুবই তুচ্ছ।

আম্বিয়া কেরামের বিপদাপদ ও কষ্ট কাঠিন্য তাঁদেরকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে না। (আম্বিয়া বা আউলিয়া কেরামের উপর বিপদাবলী আপতিত হয়, কিন্তু তাঁরা সে বিপদাদের ফলে মর্মাহত হন না।) তাঁদের আনন্দের অবস্থাকে নষ্ট করতে পারে না। কেননা তাঁরা দোয়ার মাধ্যমে খোদার সহায়তা ও আশ্রয়ে জীবনযাপন করেন।

দেখ! যদি শাসন ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তির সাথে কারো সুসম্পর্ক থেকে থাকে যিনি বিপদের সময় তাকে সাহায্য করতে পারেন তবে এমন ব্যক্তি সাধারনত বিপদের সময় তত বেশি কষ্ট বা ভয় পাবে না, বিশেষ করে সেই শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির হাতে যদি তার বিপদ দূর করার মত সুযোগ থাকে। অতএব একজন মুমিন যার সম্পর্ক আহকামুল হাকেমিন আল্লাহ্‌র সাথে, সে কেন বিপদের সময় দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হবে? আম্বিয়া কেরামের ওপর যে ধরনের মহাসংকট আপতিত হয়- তার দশ ভাগের এক ভাগ বিপদও যদি অন্যদের ওপর আপতিত হয় তবে সে তার বেঁচে থাকার শক্তিই হারিয়ে ফেলবে। তাঁরা যখন পৃথিবীতে সমাজ সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হন তখন দুনিয়ার সবাই তার শত্রু হয়ে যায়, লাখ লাখ মানুষ তার রক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন ভয়ংকর শত্রুও তার শান্তিকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির একজন শত্রুও থাকে তবে সে নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ মনে করে না। অথচ নবী (আ.)গণের শত্রু তো পুরো দেশ জুড়ে থাকে অথচ তাঁরা শান্তিতে বসবাস করেন।

সকল প্রকার তিক্ত ও যন্ত্রনাদায়ক পরিস্থিতির বিপরীতে তারা শান্ত থেকে সহ্য করে চলেন। তাঁদের এই সহনশীলতাও এক প্রকার মোজেযা বা কারামতস্বরূপ। নবী করীম (সা.)-এর দৃঢ় ও অবিচল অবস্থানই তো তাঁর লাখ লাখ নিদর্শনের মধ্যে বড় নিদর্শন। পুরো জাতি এক দিকে একত্রিত হয়ে বলল, জাগতিক সম্পদ, রাজত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, সুন্দরী রমনীর সাথে বিয়ে ইত্যাদি যা চাও তাই দেয়া হবে– কিন্তু কলেমা **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** বলা থেকে বিরত থাক। কিন্তু এসব কিছু বাদ দিয়ে মহানবী (সা.) বললেন, আমি তো নিজ থেকে কিছু বলছি না, আল্লাহ্‌র নির্দেশে বলছি। যদি নিজ থেকে বলতাম তবে তোমাদের প্রস্তাব মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। এরপর যে অসহনীয় নির্যাতন সহ্যকরে যাওয়া– এ তো সাধ্যাতীত মোজেযা, যা তিনি দেখিয়েছিলেন। এত ধৈর্য্যশক্তি তো সেই দোয়ার ফল ছিল যা একজন মুমিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। এমন মানুষের হৃদয়গ্রাহি দোয়া তো অনেক সময় রক্তপিপাসু খুনিদের প্রাণবিনাশী আক্রমনকেও ব্যর্থ করে।

নিশ্চয় আপনারা নবী করীম (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর যাত্রার ঘটনা শুনেছেন। আবু জেহেল একধরণের বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে তাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা.) আবু জেহেলের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং নবী করীম (সা.)-কে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কোন সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, হুযূর (সা.) মধ্যরাতে কা'বা গৃহে নামায পড়তে আসেন। একদিন সন্ধ্যার পর ওমর (রা.) কা'বা গৃহে ওৎ পেতে

রইলেন।

মধ্যরাতে জঙ্গল থেকে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** ধ্বনি শুনতে পেলেন। হযরত ওমর (রা.) ভেবেছিলেন, মহানবী (সা.) সিজদারত হলে তাঁকে হত্যা করবেন। মহানবী (সা.) হৃদয় বিদারক দোয়া শুরু করেছিলেন। সিজদারত অবস্থায় তিনি (সা.) এমন ভাবে আল্লাহ্‌র হামদ(প্রশংসা) ও যিকরে এলাহি করছিলেন যে, ওমরের হৃদয় গলে গেল। তাঁর সকল সাহস হারিয়ে গেল, হত্যার জন্য উদ্ধ্যত হাত থেমে গেল। নামায শেষে মুহাম্মদ (সা.) বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, পিছনে পিছনে ওমর (রা.)। নবী করীম (সা.) সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, পিছনে হযরত ওমর (রা.)। হুযূর (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার পিছু ছাড়বে কি না? বদ-দোয়ার ভয়ে ওমর (রা.) বলে উঠলেন, আপনাকে হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি, দয়া করে আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন না। পরবর্তিতে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, এ ছিল প্রথম রাত, যখন আমার মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসা জেগেছিল।

(মালফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯-৬১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কথা প্রসঙ্গে বললেন,

আমাদের বিরোধিতা কেবলই বিরোধিতা বশতঃ। সব বিষয়ে তারা আমাদের কথার বিপরীতে অভিযোগ করে। কারণ তাদের অন্তরে দুষ্টামি। ফলে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। নির্বোধেরা বলে, তিনি নিজ অবস্থানে বসে আছেন কিছু করেন না। কিন্তু ভেবে দেখে না যে মসীহ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে কোথাও লেখা নেই, তিনি যুদ্ধ করবেন বরং লেখা আছে মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে কাফের মারা পড়বে। অর্থাৎ তিনি দোয়ার মাধ্যমে সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন। আমি যদি জানতাম, আমার বাইরে ঘুরে বেড়ালে, শহরে ঘুরে বেড়ালে মানুষের উপকার হবে তবে আমি এক মুহূর্তও এখানে বসতাম না। কিন্তু আমি জানি বাইরে ঘুরে বেড়ালে জুতা ক্ষয় ছাড়া আর কোন লাভ নেই। আমরা যা অর্জন করতে চাই তা কেবল দোয়ার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। দোয়ার মধ্যে অনেক শক্তি আছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একবার এক বাদশাহ্ এক দেশের উপর আক্রমনের জন্য যাত্রা করে। রাস্তায় এক ফকির বাদশাহ্‌র ঘোড়ার লাগাম ধরে বলেন, সামনে এগুলে আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করব। বাদশাহ্ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার মত সহায়-সম্বলহীন মানুষ আমার সাথে যুদ্ধ করবে কিভাবে? ফকির উত্তর দেন, আমি ভোর রাতের দোয়ার অস্ত্র দিয়ে তোমার সাথে যুদ্ধ করব। বাদশাহ্ বলে, আমি তোমার সাথে লড়তে পারব না- এই বলে সে ফিরে চলে যায়। মোটকথা দোয়ার মধ্যে আল?াহ্ অনেক শক্তি রেখেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে বার বার বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমে হবে। আমাদের আসল অস্ত্রই হল দোয়া। এ ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন অস্ত্র নেই। গোপনে আমরা যা কিছু প্রার্থনা করি সেটাই আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন। ইতোপূর্বেও নবীদের যুগে আল?াহ্ কোন কোন বিরোধীকে নবীর মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ জানেন আমরা খুবই হীনবল এবং অমাদের দুর্বলতা অনেক। তাই তিনি আমাদের সমস্ত কাজ নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। কাঠমোল্লা ও শুষ্ক দার্শনিকরা বোঝে না ইসলামই এখন একমাত্র পথ।

আমাদের জন্য যদি যুদ্ধের পথ খোলা থাকত তবে সমস্ত উপকরণও পাওয়া যেত। আমাদের দোয়াগুলো এক কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছালে মিথ্যাবাদীরা নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অজ্ঞ শত্রুদের অন্তর কালিমা যুক্ত। তারা বলে খাওয়া দাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। কিন্তু আমাদের কাছে দোয়া ছাড়া আর কোন ধারালো অস্ত্র নেই। যে বুঝে, আল্লাহ্ তাআলা আজ যে কোন ভাবে ইসলামের উন্নতি করতে চান, সে ভাগ্যবান। (মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)

আজ আমি আপনাদের সামনে দোয়ার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও দোয়ার বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করুন। সদা সর্বদা আমাদের সামনে খোদা অবস্থান করুন। স্বাচ্ছন্দ্য ও কঠিন উভয় সময়েই যেন আমরা খোদার সামনে অবনত মস্তকে দোয়ায় রত থাকি এবং দোয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হতে বয়আতের ফলে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের ওপর ন্যাস্ত হয়েছে তা যেন আমরা বুঝতে পারি। এখন যেন আমরা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে আল?াহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। আল? াহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমরা যেন আমাদের ধর্মকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে থাকি আর এজন্য দোয়াও করতে থাকি। বর্তমানে যখন বিরোধিরা আমাদের ওপর জোরালো আক্রমন চালাচ্ছে তখন জামা'তের নিরাপত্তার জন্য আমাদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা যেন শত্রুদের আক্রমণকে তাদের ওপরেই উল্টে দেন এবং আমাদের জামা'তের হেফাযত করেন।

اللهم انا نجعلك في نحورهم
و نعوذبك من شرورهم

হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে বিরোধিদের সামনে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رب اني مظلوم فانتصر

হে আমাদের প্রভু! আমরা বড় অত্যাচারিত, তুমি আমাদের পক্ষথেকে প্রতিশোধ গ্রহন কর।

رب كل شيء خادمك رب فاحفظني
و انصرني و ارحمني

হে আমাদের প্রভূ! প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেকটি জিনিস তোমার আজ্ঞাবহ। সুতরাং তুমি আমাকে নিরাপদ কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে হেফাযতে রাখ এবং আমার প্রতি দয়া কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি বিশেষ দোয়া হল-

رب توفني مسلما و
الحقني بالصالحين

হে আমার প্রভূ! আমাকে মুসলমান করে মৃত্যু দাও এবং পুণ্যবানদের সাথে শামিল কর।

আমরা সর্বদা সালেহীন বা পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকি। আল্লাহ্ আমাদের দোয়া কবুল করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রদর্শিত পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন, যে পথে তিনি (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন।

অনুবাদ :
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

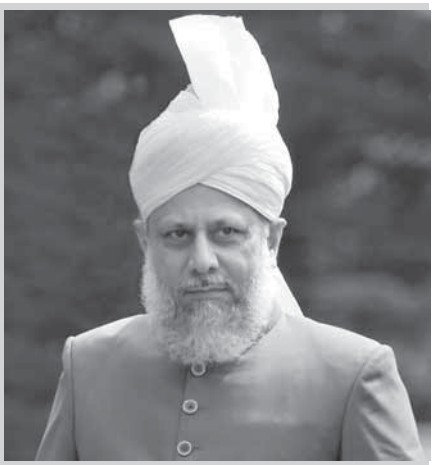

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করতে সক্ষম হই তাহলে রমযানের প্রতিটি দিনই আমাদের ঈদের দিন

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ইং তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيم * مَالك يَوْمِ الدِّين *
إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহুদ, তাআউ'য ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ২০৮ ও ২০৯নং আয়াত থেকে তেলাওয়াত করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۸﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا
تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۹﴾

অর্থাৎ–আর এমন মানুষও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ্ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা সবাই আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আজ আল্লাহ্ তাআলার ফজলে আমরা আরেকটি ঈদুল ফিতর উদযাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পুরো এক মাস তাঁর নির্দেশিত পন্থায় আমরা নিজেদেরকে ঐসব কর্মকান্ড থেকেও বিরত রেখেছি যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় করতে কোন বাধা নিষেধ নেই। পরন্তু এগুলো করা সব দিক থেকেই বৈধ। আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, কুরআন করীমকে বুঝা ও এর তেলাওয়াতের বরকতে (কল্যাণে) আশীষ মন্ডিত হওয়ার জন্য গত ২৯ দিন নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছি। খোদা তাআলার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে চারিত্রিক মানদন্ডকে এতোটা উন্নীত করার চেষ্টা করেছি, পুর্বের অবস্থা আর বর্তমান অবস্থার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অত্যন্ত দু:খ-কষ্ট ও দুরবস্থার মাঝেও সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করেছি। নিজ প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ধৈর্য ধারণ করেছি যে আর এসব কিছু আনুগত্যের সর্বোচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠা কল্পে করেছি, আর এ আনুগত্যের কারণেই আজ আমরা ঈদ উদযাপন করছি।

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি, আনুগত্যের মানদন্ডে উন্নতি, ধৈর্য্য সহনশীলতা, সর্বোচ্চ চারিত্রিক আদর্শের শিক্ষা, পুতপবিত্র পরিবর্তন, কুরআন করীম তেলাওয়াত ও খোদা তাআলার নির্দেশাবলীর উপর চলার প্রশিক্ষণ আমরা রমযানে লাভ করেছি। আজ আমরা এগুণাবলীকে নিজেদের মাঝে চির প্রতিষ্ঠিত রাখার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ঈদ উদযাপন করছি।

জান্নাতের সুসংবাদ বছরের বার মাসের মধ্যে এক মাসের আনুগত্যের কারণে নয়। বরং আজীবন আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপকারীদের জন্য এ সুসংবাদ।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۷۰﴾

(সূরা আন্ নিসা : ৭০)

এ আয়াতে বলা হয়েছে আনুগত্যের আবেগে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান ও অন্বেষণকারীদেরকে প্রতিদান হিসেবে সে জান্নাত প্রদান করা হবে তা এ জগতে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত ও যিকিরের সর্বোচ্চ মনাদন্ড প্রতিষ্ঠার কারণে হৃদয়ের প্রশান্তি হিসেবে তারা পাবে। কেননা হৃদয়ের প্রশান্তি ইবাদতের মাধ্যমে লাভ হয়। বিত্তশালীরা অধিকাংশই অস্থিরতার শিকার হয়ে থাকে। ধন-সম্পদ শান্তি দিতে

পারে না। ধনী লোকেরাই সবচেয়ে বেশি হৃদরোগ ও অস্থিরতার রোগে ভোগে। অতএব রোযার সময় আমরা যেসব চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করেছি রোযার অনুপস্থিতিতে এটাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। এ চেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। তাহলেই জান্নাত লাভ হবে। খোদা তাআলা বলেছেন, হৃদয়ের প্রশান্তিরূপে এ পৃথিবীতে জান্নাত প্রদান করা হয় যা পরকালে বাস্তবরূপে প্রদান করা হবে।

ঈদের দিনেও খোদা তাআলার আনুগত্যের খেয়াল রাখা আবশ্যক। পুণ্য লাভের যে চেষ্টা আমরা রমযানে করেছি তাই আজ তাকবীরের মাধ্যমে আবার বলছি, খোদা তাআলার মহান ও মহানুভবতা অনুধাবনের মাধ্যমে সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যে আল্লাহ্ তাআলার আনগত্যকারী হয়ে যাবে, তার প্রত্যেকটি দিনই ঈদ হবে। প্রকৃত ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পুত পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ওপর কর্ম সম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পুতপবিত্রতা চিরস্থায়ীভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে।

আজ রমযানকে ভুলে যাওয়ার দিন নয় বরং তা স্মরণ রাখার অঙ্গীকার করতে হবে, তাহলেই আমাদের ঈদ কল্যাণময় ঈদ হবে। আমাদের রমযান কল্যাণমন্ডিত রমযান হবে। আর এ ঈদ আমাদের ইহকাল ও পরকাল সজ্জিত করার ঈদ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"সেই দিনটি কোনটি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিনের চেয়ে উত্তম? তা হলো মানুষের তওবা করার দিন। কেননা ঐ দিন তার আমলনামা (কর্মলিপি) ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। অতএব রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করা হয়, সত্যিকারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের দিন হবে।

কেননা যে খোদার জন্য নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছে সে কিভাব নির্দেশাবলীর (ওপর আমলকারী থেকে) বাইরে থাকতে পারে। পুতপবিত্র পরিবর্তন সাধনাকারীদের জাগতিক বিষয়াদির প্রতি লোভ থাকে না। বরং সেতো খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের আত্মাকে (খোদাকে) সোপে দেয়।"

জীবিত থেকে খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করা হলো, চিরস্থায়ীভাবে খোদা ও বান্দার অধিকার আদায় করা। এক প্রকৃত ঈদ এটাই যখন সে তার জীবন খোদার জন্য বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পায় জামা'তে এরকম লোক হাজার হাজার রয়েছেন, যারা নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে সাজানোর লক্ষ্যে অন্যদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখে ত্যাগ স্বীকার করেন। তারা গরীব ও এতীমদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

হুকুকুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব) সম্পাদনের সাথে সাথে যখন হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য) সম্পাদন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এতীম, গরীব, মিসকীন ও অসহায়দের জন্য আহমদীদের হৃদয়কে আরো উন্মুক্ত করা আবশ্যক।

ইউ কে-এর আহমদীয়া ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন আফ্রিকার এক গ্রামে বিদ্যুত ও পানি সরবরাহের খরচের দায়িত্ব নিয়েছে। এটা একটা ভাল পরিকল্পনা। যারা এমন করে খোদা তাআলা তাদের সম্পদ ও প্রাণে বরকত ঢেলে দেন। অন্যদেরকেও এই ভাল কাজে অংশ নেয়া উচিত। লাযেমী (আবশ্যকীয়) চাঁদাসমূহ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে খরচ হয়ে যায়। এজন্য সামথ্যবান সদস্যদের এরূপ কুরবানীতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

স্ত্রী সন্তানদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তবে দৃষ্টিকে শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

ঈমানকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখানো আবশ্যক। এটা সঠিক নয়, নিজের লাভ দেখলে জামা'তের ব্যবস্থার কাছে আসবো, আর নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেখলে রাষ্ট্রীয় আদালতে যাব। শয়তান পরিপূর্ণ আনুগত্য থেকে বাধা দেয়ার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে। এজন্য খোদা তাআলার সাহায্য যাচনা করে এমন চেষ্টা অব্যাহত রাখুন যাতে শয়তান দ্বিতীয়বার চড়ে বসতে না পারে। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তাই প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা করা আবশ্যক। রমযানের আনুগত্যের বিষয়টিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে আকড়ে থাকুন। এর মাঝেই সুসংবাদ নিহিত।

উদখুলু ফিস্‌সিলমে কাফ্‌ফাতান এর অর্থও এটাই, পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি পুরোপুরি আস্থা থাকা আবশ্যক। এক আহমদীকে স্মরণ রাখা আবশ্যক আমরা একটি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেই পুণ্য পুণ্য বলে সাব্যস্থ হবে। অতএব জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং জামা'তের আনুগত্য করাও পুণ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং অগ্রগামী হওয়ার কারণ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন আনুগত্য ও নিষ্ঠার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারি। ঐ কর্ম যেন সম্পাদন করি যেটা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টির রাস্তায় পরিচালিত করবে। যদি এমন হয়, তাহলে এটাই ঐ উদ্দেশ্য যে কারণে খোদা তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সবাইকে ঈদ মোবারক। কিছু দেশে আহমদীরা এমন ভাবে ঈদ উদযাপন করছে যে তারা তা প্রকাশ করতে পারছে না। আল্লাহ্ তাআলা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিন যাতে তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অনুসারে স্বাধীনভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারে। নিজেদের দোয়ায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দীদের, শহীদদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের, অসুস্থ, আর্থিক কুরবানী দাতা, অভাবী, দূর্বল ও অসহায়দেরকে স্মরণ রাখবেন।

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৯-১৫ অক্টোবর ২০০৯ইং)

[পুন:মুদ্রিত]

অনুবাদ : **মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতা

বক্তা: মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী
উকিলে আলা তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।

সম্মানিত সভাপতি এবং প্রিয় শ্রোতামন্ডলী!

যেভাবে আপনারা শুনেছেন, আজকের এই আশিসপূর্ণ অধিবেশনে এই অধমকে মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতা বিষয়ে কিছু বলতে হবে, ওয়া বিল্লাহেত্ তওফিকী। (আল্লাহ্ তাআলা তৌফিক দিন)

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(সূরা আল হাশর : ২২)

অর্থাৎ 'অতএব এই কুরআন যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যদি কোন পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি যেন মানুষ ঐশী বাণীর মাহাত্ম্য বুঝার জন্য চিন্তাভাবনা করে'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৈয়দনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন: **'কোন ব্যক্তি ঐশী ভালবাসা ও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি বৈশিষ্ট্য বা গুণ তার মাঝে জন্ম না নেয়। প্রথমতঃ অহংকার পরিহার করা, যেভাবে সুদৃঢ় পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তা ধ্বসে মাটিতে মিশে যায়। অনুরূপভাবে মানুষের উচিত, সকল প্রকার গর্ব ও অহংকার পরিহার করা আর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা।'**

শ্রোতামন্ডলী! এ আয়াতে এই গুঢ়তত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা-ই সেই সত্তা ছিল, যিনি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সকল মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন, একারণেই পবিত্র কুরআনের মত মহা মর্যাদাপূর্ণ বাণী তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর বিনয়, নম্রতা ও কোমলতায় উন্নতি করে তিনি আপন সত্তাকে এত বেশি বিলীন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার সত্তায় এমনভাবে বিলীন হয়ে বা মিশে গেছেন যে, খোদার নৈকট্যের ক্ষেত্রে তিনি সেই মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন যে পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারাও পৌঁছতে পারে নি। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

'সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ উৎকর্ষ মানবকে, যা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি-মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা জহরতে। মোটকথা তা আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষের মধ্যেই ছিল না। ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম- পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬১)

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী! এই গোটা বিশ্বজগতে আল্লাহ্ তাআলা যাকে সবচেয়ে উন্নত ও মহান গুণাবলী ও অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (যাঁর জন্য আমাদের পিতামাতা উৎসর্গীত) তিনি আমাদের মনিব ও অভিভাবক, নবীদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। যাঁর প্রশংসায় স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(সূরা আত্ তাওবা:১২৮)

অর্থাৎ 'নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তোমাদের কষ্ট ভোগ করা তাঁর কাছে অসহনীয় এবং সে তোমাদের কল্যাণের পরম আকাঙ্ক্ষী। সে মু'মিনদের প্রতি অতি মমতাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াতের তফসীরে বলেন: **'আকর্ষণ ক্ষমতা এবং দৃঢ়চিত্ততা একজন মানুষকে তখনই দেয়া হয় যখন সে ঐশী নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে আর খোদার প্রতিচ্ছায়া হয় আর সে সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও তাদের কল্যাণের জন্য নিজের মাঝে ব্যাকুলতা অনুভব করে। আমাদের নবী (সা.) এই গুণের ক্ষেত্রে সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এর চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন, একারণে তিনি সৃষ্টির দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আজিজুন আলাইহি আনিতুম অর্থাৎ তোমাদের কষ্টে নিপতিত হওয়া এই রসূলের জন্য অসহনীয়, এতে তিনি চরম ব্যাথিত এবং সবসময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে তোমাদের অশেষ কল্যাণ প্রত্যাশা করেন'।**

উপস্থিত শ্রোতামন্ডলী! এটি সেই গুণ এবং আদর্শ যার ভিত্তিতে তাঁর মাঝে বিনয়, নম্রতা এবং প্রতিশোধের পরিবর্তে মার্জনা এবং উপেক্ষা করার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। এটিই সেই দারিদ্রতার মাঝেও গৌরবের পরিচয়; তিনি এক ব্যক্তিকে যে তাঁর প্রভাব ও শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপছিল, তিনি বলেন, এত ভয় পেও না; আমি তো

এমন এক মায়ের সন্তান যিনি শুকনো মাংশের টুকরো খেতেন। এটিই সেই সহানুভূতি আর দয়া যারফলে তিনি (সা.) একজন শ্রমিকের ঘর্মাক্ত শরীর জড়িয়ে ধরেন আর দারিদ্র ও কষ্টের জীবন বেছে নেন আর দোয়া করেন, আল্লাহ্ যেন তাঁকে দরিদ্র এবং অসহায়দের সাথে রাখেন আর তাদের মধ্য হতেই উত্থিত করেন। আর এটি সেই মহান বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে তিনি (সা.) বলেছেন, আমাকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করো না আমার উপাধি 'আবদ'। আর এভাবে এই পার্থিব জগতের আকর্ষণ ও আকাঙ্খার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। হে আমার আল্লাহ্! শান্তি, আশিস ও কল্যাণ বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয় তুমি মহা

প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

শ্রোতামন্ডলী! শিশুকাল থেকেই তিনি (সা.) **স্বল্পেতুষ্ট** আর বিনয়ের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত উম্মে আইমন বর্ণনা করেন, **'আমি কখনোই নবী করীম (সা.)-কে (না শিশুকালে আর না-ই বড় বয়সে) ক্ষুৎপিপাসার জন্য অভিযোগ করতে শুনিনি।**

বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষী যে, মহানবী (সা.) সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি কোন বস্তুর ভালো গুণাগুণ বর্ণনার পাশাপাশি যদি তার মধ্যে কোন খুঁত থেকে থাকে তাহলে তাও বলে দিতেন। খোদার ইচ্ছানুসারে তিনি (সা.) আরবের পবিত্র এবং ধনী নারী হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত খাদীজাহ্ (রা.)-কে বিয়ে করার সুবাদে তিনি (সা.) অঢেল ধন-সম্পদের মালিকানা লাভ করেন, কিন্তু তিনি বলেন, তিনি তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চান; তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী একান্ত বিনয়ের সাথে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন আর বলেন, আপনি যেভাবে খুশী তা ব্যবহার করুন। এরপর তিনি (সা.) তা গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে এই বিয়ের ফলে সদাপ্রস্তুত সারি সারি কৃতদাসের দল তিনি লাভ করেন কিন্তু এই মানবদরদী স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, আমার-ই মত মানুষকে কৃতদাস বানিয়ে রাখা আমার পছন্দ নয়। তাঁর অনুগতা স্ত্রী এসব কৃতদাসকে স্বাধীন করে দেয়ার অধিকার তাঁকে প্রদান করেন। ফলে তিনি (সা.) সকল কৃতদাসকে মুক্ত করে দেন।

শ্রোতামন্ডলী! মানুষের হয় ধন-সম্পদের অহংকার থাকে অথবা বংশ মর্যাদার কিন্তু কতই না মহান আমাদের মহানবী (সা.), তিনি এত ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়ি এবং চাকর-বাকর পাওয়া সত্ত্বেও কখনো অহংকার বা গর্ব করেন নি বরং বিনয় ও নম্রতার একান্ত উন্নত এবং উত্তম আদর্শ স্বীয় অনুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুবহানাল্লাহ্॥ (আল্লাহ্ অতি পবিত্র)

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! যখন মানবজাতির সংশোধনের দায়িত্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি অর্পণ করা হচ্ছিল আর হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, 'ইক্বরা' অর্থাৎ আপনি পাঠ করুন। তখন খোদার মহিমার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের যোগ্যতা ভুলে গিয়ে একান্ত বিনয়ের সাথে তিনি বলেন, 'মা আনা বেক্বারিইন' অর্থাৎ আমি পড়তে পারি না বা আমার ভেতর পড়ার যোগ্যতা নেই। নবুয়ত লাভ করার পূর্বে স্বীয় দুর্বলতা স্বীকার করা ছিল মূলতঃ সেই উন্নত পর্যায়ের বিনয় যা তাঁর স্বভাব এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

অতএব তিনি বিনয়ের সেই পোষাক পরিধাণ করেছেন যা ইতোপূর্বে কোন মানুষ অবলম্বন করেনি।

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! বিনয় ও নম্রতা মূলতঃ সেই অসাধারণ গুণের নাম যা থেকে প্রকাশ পায়, শক্তিমত্তা সত্ত্বেও মানুষ স্বয়ং নিজেকে অধম মনে করে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, এখানে শুধু অনুবাদ পড়ছি। 'আর মানুষের সাথে গাল ফুলিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে দম্ভ ভরে চলো না। আল্লাহ্ তাআলা অহংকারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।' (সূরা বনী ইসরাঈল:৩৮)

সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী! এখন যে হাদীস আমি আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা এতটাই মনমুগ্ধকর যে, এর অক্ষরে অক্ষরে মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহানবী (সা.) স্বীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

'আলা ওয়া আনা হাবীবুল্লাহি ওয়ালা ফাখরা' শোন! আমি আল্লাহ্‌র বন্ধু আর এতে কোন অহংকার নেই।

'ওয়া আনা হামিলু লিওয়ায়েল হামদে ইয়াওমাল কিয়ামাতে ওয়ালা ফাখরা' আমি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পতাকা বহন করবো কিন্তু এতে কোন গর্ব নেই।

'ওয়া আনা আওয়ালু শাফিঈন ওয়া আওয়ালু মুশাফ্‌ফাঈন ওয়ালা ফাখরা' কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী আমিই আর আমার শাফায়াতই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে কিন্তু এতে কোন গর্ব নেই।

'ওয়া আনা আওয়ালু মাইইউ হাররিকু উলকাতাল জান্নাতি ফাইয়াফতাহুল্লাহু লী ফাইউদখিলনীহা ওয়া মা'ইয়া ফুকারাউল মু'মিনীনা ওয়ালা ফাখরা' সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের কড়া নাড়বো, আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য তা খুলবেন আর আমাকে প্রবিষ্ট করবেন, আমার সাথে গরীব, অসহায় মু'মিনরা থাকবে কিন্তু এতে কোনরূপ অহংকার নেই।

'ওয়া আনা আকরামুল আওয়ালীন ওয়াল আখারীনা ওয়ালা ফাখরা' আমি পূর্বাপরের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কিন্তু কোন গর্ব নেই। কেননা মহত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই শোভনীয়।

এই ছিল মহানবী (সা.)-এর অন্তরের অবস্থা। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুসারে স্বীয় মোকাম ও পদমর্যাদা প্রকাশ করেছেন ঠিকই কিন্তু কতটা বিনয় ও নম্রতার সাথে যে, এর তুলনায় উত্তম আর কিছু ভাবাই যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র অন্তর থেকেই এই পবিত্র শিক্ষার ঝর্না প্রস্ফুটিত হয় আর তিনি খোদার কাছ থেকে জ্ঞান ও মারেফত (তত্ব) লাভ করে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, **'মা তাওয়া যায়া আহাদুল লিল্লাহি রাফায়াহুল্লাহু'** বান্দা যখন স্বীয় খোদার জন্য বিনয় অবলম্বন করে তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তার মর্যাদা উন্নীত করেন।

শ্রোতামন্ডলী! দৈনন্দিন লেন-দেনের বেলায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, একজন দায়ীলাল্লাহ্ হিসেবে, একজন স্বামীর কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে. একজন পিতার দায়িত্ব পালনের বেলায়, মহান ন্যায়বিচারক হিসেবে, মোটকথা যেকোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন তিনি কখনোই, ধৈর্য ও বিনয়ের আঁচল হাত ছাড়া হতে দেন নি আর কখনোই অহংকার ও আত্মশ্লাঘাকে কাছে ঘেষতে দেন নি। তিনি শান্তি ও সৌহার্দ্রের সর্বোত্তম ধর্ম ইসলামকে যে (শান ও শওকত) ঐশ্বর্য ও প্রতাপের সাথে তুলে ধরেছেন তা একান্ত বিনয় ও নম্রতার বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে, কোনক্রমেই জোর-জবরদস্তি, উগ্রতা, অবজ্ঞা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ নয়; যেভাবে বর্তমান সময়ের মোল্লারা ইসলামের চিত্র উপস্থাপন করে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **'ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম'** (সূরা আল্ কলম:৫)

অর্থাৎ আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত।

তিনি (সা.) এত উত্তমভাবে সাহাবীদের তরবিয়ত করেছেন যে, তাঁরাও নিজেদের জীবনে বিনয় ও নম্রতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি তত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যা বর্ণনা করেছেন তাহলো, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ স্মরণ রেখ! নিজ প্রভুকে চেনার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে স্বয়ং তোমার নফস বা আত্মা। অনরূপভাবে একান্ত বিনয়ের সাথে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে এটি বুঝান বলে দেখা যায়, তোমাদের মধ্য হতে কেউই তার কর্মের কারণে জান্নাতে যাবে না। সাহাবারা বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার আমলও কি? তিনি বলেন, জ্বি হাঁ। যদি খোদার রহমত আর কৃপার চাদর আমাকে আবৃত না করে তাহলে

আমিও জান্নাতে যেতে পারবো না। (মুসলিম)

মোটকথা, তিনি (সা.)-এর গোটা জীবন বিনয় ও নম্রতার দর্পণ স্বরূপ। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা ও বিবরণ তুলে ধরছি।

তাঁর পবিত্র সহধর্মীনি হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন: 'তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে গৃহকর্মে সাহায্য করতেন। স্বয়ং কাপড় ধুতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। উট বাঁধতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন। আটা মাখাতেন, বাজার থেকে নিজের জিনিষ-পত্র নিজেই বয়ে আনতেন আর সেবকদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

পরিবারের মধ্য থেকে যখনই কেউ ডাকতেন তিনি (সা.) সর্বদা বলতেন আমি উপস্থিত আছি।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বিধবা এবং দরিদ্রদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদের সাথে যাওয়াকে কোনরূপ লজ্জাজনক মনে করতেন না। (দারমী)

হযরত হামযা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মাঝে এমনসব গুণাবলী ছিল যা অহংকারী ও আত্মম্ভরীদের মাঝে থাকে না। তিনি (সা.) রঙ-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন আর গাধার পিঠে আরোহন করে যেতেন।

একদা এক ইহুদী মহানবী (সা.)-কে নিমন্ত্রণ করে, ইহুদী খাবার হিসেবে জব বা ভুট্টা আর চর্বি দেয় আর তিনি স্বানন্দে তা আহার করেন।

একবার একজন এ বাক্যে তাঁকে সম্বোধন করেন যে, 'হে আমাদের মনিব! এবং আমাদের মনিবের পুত্র! হে আমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম এবং সর্বোত্তমের সন্তান! তিনি (সা.) বলেন, পবিত্রতা অবলম্বন কর, শয়তান তোমাদের পদস্খলন না ঘটায়; আমি আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ–খোদার অধম বান্দা এবং তাঁর রাসূল। খোদা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তার চেয়ে তোমরা আমাকে বেশি সম্মান দাও তা আমি পছন্দ করি না।'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড-পৃষ্ঠা: ১৫৩)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, একবার মহানবী (সা.)-এর সাথে বাজারে যাই, তিনি (সা.) কাপড়ের দোকানে যান আর সেখানে থেকে চার দিরহাম দিয়ে পায়জামার কাপড় ক্রয় করেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে হুযূর (সা.)-এর কাছ থেকে অর্থ আদায় করার জন্য যখন দোকানদার রৌপ্যমুদ্রা ওজন করতে থাকে তখন তিনি (সা.) বলেন, পাল্লাকে ঝুঁকতে দাও। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে দোকানদার কিছুটা বেশি পায়। এটি দেখে দোকানদার বিস্মিত ও আশ্চর্য হয় কেননা প্রথমবার কোন ক্রেতা তার লাভের কথা বলছে।' (হাশমী)

হযরত আমের বিন রবীয়াহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হই। তখন মহানবী (সা.)-এর জুতার ফিতা ছিড়ে যায়, আমি হুযূরের জুতো নিয়ে তা ঠিক করতে আরম্ভ করি– তিনি (সা.) আমার হাত থেকে জুতা কেড়ে নেন আর বলেন, এটি অগ্রাধিকার সূলভ বা বৈষম্য মূলক ব্যবহার আর আমি নিজের জন্য অগ্রাধিকার বা কোনরূপ প্রাধান্য পছন্দ করি না।' (হাশমী)

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্য বিশ্বজগতের নিয়ামতরাজি সরবরাহ করেছেন কিন্তু তিনি তা থেকে শুধুমাত্র তা-ই গ্রহণ করেছেন যার উল্লেখ করে বলেন: **'আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে এই সম্মান দিয়েছেন যেন, আমার জন্য মক্কার উপত্যকাকে স্বর্ণ দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হয়। আমি নিবেদন করি, এর প্রয়োজন নেই। হে আমার প্রভু- প্রতিপালক! একদিন কিছু আহার করলে পরের দিন অনাহারে থাকাতেই আমি সন্তুষ্ট। কেননা, যখন অনাহারে থাকব তখন তোমার দরবারে অনুনয়-বিনয় করবো আর তোমার স্মরণে রত হবো। আর যখন পেটপুড়ে আহার করবো তখন তোমার মহিমা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যাপৃত থাকবো।'**

(তিরমিযী- কিতাবুয্ যোহদ)

বিশ্বজগতের নেতা মহানবী (সা.)-এর বিছানা ছিল শক্ত চামড়ার যার ভেতর খেজুরের নরম আঁশ ভরা ছিল। আর বালিশের ভেতর ঘাস ভরা ছিল। একদা যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত উমর (রা.) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, **'হুযূর আমার পিতামাতা আপনার (সা.) জন্য উৎসর্গীত, রোম সম্রাট এবং পারস্য সম্রাট (কায়সার ও কিসরা) রেশমী গদীতে আরাম করে অথচ আপনার অবস্থা এমন'। একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, 'হে উমর! তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, এই আরাম ও উপকরণ পরকালে তুমি লাভ করবে? আর পার্থিব লোকদের জন্য কেবল ইহজগতেই।'** (বুখারী কিতাবুত তফসীর)

হযরত উমর (রা.) উমরাহ্ পালনের জন্য অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি প্রদান করেন এবং একান্ত বিনয়ের সাথে বলেন, 'হে আমার প্রিয় ভাই! আমাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখতে ভুলো না।' হযরত উমর (রা.) বলেন, 'একথায় আমি এত আনন্দিত হই যে, পুরো বিশ্বও যদি পেয়ে যেতাম তবুও এত আনন্দ হত না।' (আবু দাউদ)

শ্রোতৃবৃন্দ! মক্কা ও মদীনার অলি-গলিতে দুর্বল ও বৃদ্ধদের বোঝা বহণ করে কে গন্তব্যে পৌঁছে দিত? নিশ্চিতরূপে তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

এরপর হযরত হাসান বিন আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত– তিনি বলেন, **'মহানবী (সা.) যখন কারো প্রতি দৃষ্টি দিতেন তখন পুরোপুরি থাকতেন, দৃষ্টি সর্বদা অবনত থাকতো। মনে হত যেন, উপরের চেয়ে মাটির দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। তিনি (সা.) সর্বদা অর্ধ-নিমিলীত চোখে দেখতেন, স্বীয় সাহাবাদের পিছু পিছু হাটতেন আর যখন কোন বিশেষ স্থানে যেতেন তখন তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেক সাক্ষাত প্রার্থীকে প্রথমে সালাম করতেন'।** (শামায়েল তিরমিযী)

সম্মানিত সূধি! মক্কা ছিল তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি যেখান থেকে তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু খোদার মহিমায় দেশান্তরের মাত্র আট বছর পর যখন তিনি বিজয়ীর বেশে সেই শহরে প্রবেশ করেন তখন সাহাবীদের দশ হাজার সৈন্য দল তাঁর সাথে ছিল। তিনি চাইলে বাহ্যিক জাঁক-জমক ও দোর্দন্ড প্রতাপের সাথে প্রবেশ করতে পারতেন যাতে মক্কাবাসীদের হৃদর শিউরে উঠতো। কিন্তু খোদার এই বিনয়ী বান্দা কত নম্রতার সাথে মক্কা নগরে প্রবেশ করেন। পরাজিত জাতির লোকেরা দলে দলে বিজিত নগরকে দেখার জন্য বেরিয়ে আসে কিন্তু সেখানে ছিল বিস্মিত হবার মত দৃশ্য। মহানবী (সা.) কোন উন্নত জাতের ঘোড়ার পিঠে নয় বরং একটি উটের পিঠে বসা ছিলেন আর কোন গৌরব বা অহংকারেরতো প্রশ্নই উঠে না বরং বিনয় ও নম্রতার কারণে তাঁর গ্রীবা অবনত ছিল আর ক্রমশঃ তা ঝুঁকতেই থাকে। এ পর্যন্ত যে, তাঁর কপাল উটের হাওদার বা পাক্কীর কাঠে গিয়ে ঠেকতে থাকে। তিনি স্বীয় প্রভুর সমীপে কৃতজ্ঞতার সিজদাহ্ করছিলেন। তাঁর মুখ তখন খোদার মাহত্মের গান গাইছিল। সত্যিকার অর্থে তখন তাঁর শরীরের প্রতিটি রক্তকণা খোদার সমীপে কৃতজ্ঞতার সিজদাহ্ করছিল।

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা এবং শক্তি নিয়ে সবচেয়ে বেশি অহংকার করে।

জাগতিক বাদশাহ্ যখন কোন দেশ জয় করে তখন তার সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে নষ্ট করে ফেলে আর এ কারণেই আজ আমরা বিভিন্ন পরাভূত এলাকায় অমানবিক যুলুম-নির্যাতন হতে দেখি কিন্তু আমাদের মনিব ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বিস্ময়কর ও অনন্য মর্যাদা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি বিনয় তখন প্রদর্শন করেছেন যখন জীবনের সবচেয়ে মহান বিজয় তিনি চরম মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে লাভ করেন। এবং সেদিন তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন আর সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানী (রা.) যিনি সম্পর্কে তাঁর বোন ছিলেন তাঁর ঘরে তশরীফ নিয়ে যান আর জিজ্ঞেস করেন, খাবারের কিছু থাকলে দাও। তিনি বলেন, ঘরে কেবলমাত্র শুকনো রুটি আর সিরকা আছে। সুতরাং তিনি (সা.) তা-ই আহার করেন আর বলেন, সিরকা কতই না উত্তম তরকারী। (আবু দাউদ কিতাবুস সওম)

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) তাঁর ১১ মার্চ ২০০৫ সালের জুমুআর খুতবায় বলেন: **'তিনি ছিলেন দু' জাহানের মহান বিজয়ী, পৃথিবীর রাজাধিরাজ কিন্তু একই সাথে বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ। এটি ছিল তাঁর বিজয়ের মুহূর্তের চিত্র। তাঁর রীতি ছিল, যাত্রাকালে এবং উঁচু স্থানে আরোহণের সময়ও আল্লাহ্ আকবর পাঠ করতেন– যাতে এই বাণী থাকত যে, আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়, সকল মহত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র জন্যই প্রযোজ্য।'**

সৈয়দনা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে বলেছেন, **'যার হৃদয়ে এক শস্য পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'**

সৈয়দনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'মহা প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে অহংকার চরম অপছন্দনীয়।'**

সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গোটা জীবনও তাঁর মনিব ও অভিভাবক খাতামান্নবীঈন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শের পূর্ণ অনুসরণে কেটেছে। তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছে, 'তোমার বিনয়াবনত পন্থা তিনি পছন্দ করেছেন।' (ইলহাম ১৮মার্চ, ২০০৭ তাযকিরাহ্)

'যে অহংকার পরিত্যাগ সে আল্লাহ্‌কে পায়

হে যারা পরীক্ষা করতে চাও তোমরা এই ব্যবস্থাপত্রটিও পরীক্ষা করে দেখ।'

শ্রোতামন্ডলী! অহংকার ও গর্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার জন্য ইস্তেগফার করা আবশ্যক, এর পাশাপাশি বিনয় এবং নম্রতার বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে সৃষ্টি করা চাই। নম্রতা ও বিনয় বশে নিজের দোষ-ত্রুটির জন্য নিজেকে দায়ী করা আর নিজের মাঝে যা কিছু উত্তম বা ভালো আছে তাকে খোদার দান বলে জ্ঞান করা উচিত।

মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল বিনয় ও নম্রতার পরম পরাকাষ্ঠা। তিনি কখনো কারো মনে কষ্ট দেন নি। প্রত্যেকের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন'।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

(সূরা আল্ হাজ্জ:৩৫)

অনুবাদ: অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই, সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর। আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের।

স্বীয় প্রভুর দরবারে মহানবী (সা.)-এর অনুনয়, বিনয়, মিনতি এবং প্রার্থনা সম্পর্কে তাঁর এই বিনীত দোয়া হতেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, যা তিনি বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে করেছিলেন।

'হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শোন আর আমার অবস্থা দেখ, আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে তুমি সম্যক অবহিত। আমার কোন কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমিতো এক কপর্দকহীন এবং অভাবী। তোমার সাহায্য এবং আশ্রয়ের ভিখারী, ভীত-ত্রস্ত। তোমার সমীপে নিজের দুর্বলতা ও পাপসমূহ স্বীকার করছি, আমি তোমার কাছে এক নিঃস্ব ভিখারীর মত ভিক্ষা চাইছি। আমার গ্রীবা তোমার সম্মুখে অবনত আর আমার অশ্রু তোমার দরবারে বইছে। আমার শরীর তোমার আনুগত্যে সিজদায় পতিত আর নাক মাটিতে খত দিচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার দরবারে দোয়া করার ক্ষেত্রে দুর্ভাগা সাব্যস্ত কর না আর আমার সাথে দয়া ও করুণার আচরণ করো। হে সেই সত্তা! যিনি সবচেয়ে বেশী প্রার্থনা কবুলকারী আর সবচেয়ে উত্তম দাতা।' (মজমুয়া আল্ যওয়াদুল হাশমী- কিতাবুল্ হাজ্জ)

পরিশেষে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর একটি করে উদ্ধৃতি পাঠ করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: **'যখন দীর্ঘসময় পর ইসলামের বিজয় হয় সেদিন সম্মান ও সম্পদের কোনটিই জড়ো করা হয়নি। কোন প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়নি। কোন দরবার বসানো হয়নি। আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন রাজকীয় উপকরণ প্রস্তাব করা হয়নি। কোন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা হয়নি বরং যা কিছু পাওয়া গেছে সবই এতীম, মিসকীন, বিধবা নারী এবং ঋণীদের দেখাশোনার পিছনে ব্যয় হতে থাকে, অথচ {তিনি (সা.)} একবেলাও পেটপুরে খাবার খান নি'।**

(বারাহীনে আহমদীয়া- ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭)

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, **'রহমান খোদার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আব্দুর রহমান ছিলেন তিনি– নবীকূল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), যাঁর পবিত্র করণ শক্তি অসংখ্য রহমান খোদার বান্দা সৃষ্টি করেছে। অহংকারীদেরকে বিনয়ের পথ দেখিয়েছেন। তাদের মন-মস্তিষ্ক হতে প্রভু ও ভৃত্য আর ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করেছেন। এসব বিপ্লব কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে। হৃদয়ের এতবড় পরিবর্তন কেমন করে সৃষ্টি হল।**

কেবলমাত্র বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে, শিক্ষা দেবার ফলে হয়েছে কি? না! এর পাশাপাশি স্বয়ং দাসত্বের উন্নত মান তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বয়ং বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নিজ কর্মদ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, আমি যা কিছু বলছি তার উন্নত মানও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এই বিনয় ও নম্রতার অনুপম আদর্শ তিনি (সা.) নিজ কর্মদ্বারা দেখিয়েছেন যে, আমার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটি পরিদৃষ্ট হবে।

(জুমুআর খুতবা ১১ই মার্চ ২০০৫)

'নামেও মুহাম্মদ আর কাজেও মুহাম্মদ
তোমার প্রতি শান্তি আর তোমার প্রতি রহমত'
[হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দিন যাতে আমরাও মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণে নিজেদের মাঝে বিনম ও নম্রতা সৃষ্টিকারী হই।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারেক।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে
ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

(৪র্থ কিস্তি)

খিলাফত নির্বাচন

বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের দ্বারা গঠিত একটি প্যানেল হযরত উসমান (রা.)-কে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত করেন। মদিনায় হযরত উমর (রা.)-এর শবদেহ দাফনের তিনদিন পর এই নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং তারা নতুন খলিফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। *[মৃত্যুর পূর্বে হযরত উমর (রা.) তার পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তার নসিহত ছিল এই ছয় ব্যক্তির মধ্য থেকেই যেন একজনকে খলিফা মনোনীত করা হয়। আর তার ছেলের সম্পর্কে বলেছিলেন, তাকে পরামর্শে শামেল করবে, কিন্তু খলিফা করবে না-- অনুবাদক।]*

খলিফা নির্বাচকমন্ডলীর ছয় জন সদস্যের একজন ছিলেন আবদ-আর রহমান ইবন আওফ (রা.)। খলিফা হিসেবে কাকে মনোনীত করা হবে তা ঠিক করার জন্য তিনি এই কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত উসমানের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময়ে তিনি বললেন, আমি যদি আপনার হাতে বয়আত না করি, তাহলে আর কার হাতে আপনি বয়আত নেওয়ার কথা বলবেন? জবাবে হযরত উসমান (রা.) বলেন, 'আলী'।

আবদ-আর রহমান ইবন আওফ (রা.) তখন হযরত আলী (রা.)-কেও একইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি আপনার হাতে বয়আত না করি, তাহলে আর কার কথা আপনি বলবেন?' জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন, 'উসমান'।

এরপর আবদ-আর রহমান ইবন আওফ (রা.) যখন নির্বাচকমন্ডলীর আরেক সদস্য যুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার কথা বলো?' জবাব এলো 'আলী অথবা উসমান'। এরপর তিনি আরেক সদস্য সাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার কথা বলো? তুমি আর আমি, আমরা তো কেউই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাই না।' সাদ বলেন, 'উসমান'। (Suyuti p. 165)

এভাবে আবদ-আর রহমান ইবন আওফ (রা.) বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাকে বলা হলো বিচক্ষণ, যৌক্তিক ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উসমানের (রা.) সমতুল্য আর কাউকে তারা দেখেনি।

এভাবে, উসমানের (রা.) হাতে হাত রেখে তিনি বললেন, 'সুন্নাতুলাহ, সুন্নাতুর-রাসূল এবং রাসূলের পরবর্তী দুই খলিফার রীতি অনুসারে আমরা আপনার আনুগত্য ঘোষণা করছি।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৫)। এভাবে হযরত উসমান (রা.) ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

অর্জনসমূহ

হযরত উসমানের (রা.) খিলাফতকালকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় প্রথম ভাগে উলেখযোগ্য উন্নয়ন ও বিভিন্ন অর্জন দেখা যাবে। আর, দ্বিতীয় ভাগে বিশৃঙ্খলা, অশান্ড়ি এবং উত্তেজনাময় পরিবেশ এবং সেগুলো প্রশমনে তার প্রচেষ্ঠা পরিলক্ষিত হবে। তার খিলাফত কালের প্রথম ছয় বছরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সাধিত হয়েছে। আয্ যুহরি বলেন, "খলিফা হিসেবে উসমান বার বছর শাসন করেছেন। এর মধ্যে [প্রথম] ছয় বছর কালে মানুষ তার কোন সমালোচনাই করে নি।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৬)

তার খিলাফত কালের প্রথমার্ধের সেই ছয় বছর, শেখ মোবারক আহমদ যেভাবে বলেন, 'শান্তি, উন্নতি এবং সমৃদ্ধির' সময় ছিল। (Intrigues against khilafat, p.24)। তখন মুসলিম সেনাবাহিনী বহু নতুন অঞ্চল জয় করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে একতা ছিল আর তাদের সাফল্য লাভ করা দেখে তাদের আত্মবিশ্বাসও টের পাওয়া যাচ্ছিল।

সামরিক দিক থেকে বিচার করলে, বড় বড় বিজয়গুলোর প্রথমটি ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়। সেখানে কায়রো থেকে আগত মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয় হেরাক্লিয়াসের ছেলে কনস্ট্যান্টাইনের বাহিনী। এরপর, মুসলমানরা সাফল্য পায় সাইপ্রাসে।উসমান (রা.) উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ায় অভিযানে মুসলিম সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন আবদুলাহ বিন সাদকে। আর্মেনিয়াতে মুসলমানরা প্রায় সম্পূর্ণ অঞ্চল জয় করে এবং এভাবে তারা ইরানের কিছু এলাকা, আফগানিস্তান এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধ পর্যন্ত জয় করে। (Karen Armstrong, p.28)

আবু উবায়েদ-এর বর্ণনা অনুসারে, আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) সম্পূর্ণ কুর'আন মুখস্থ করেছিলেন। বইয়ের আকারে কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিই সম্ভবত হযরত উসমানের (রা.) সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল। এই কাজে উসমানকে (রা.) নিয়োগ করেছিলেন

হযরত আবু বকর (রা.)। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে/উচ্চারণে কুরআন পাঠ করতো। হযরত উসমান সিদ্ধান্ত নেন যে, কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এই ধরনের যাবতীয় ভিন্ন উচ্চারণ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করবেন শুধুমাত্র একটি উচ্চারণ পদ্ধতি বজায় রাখবেন। মানুষ কুরআনের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক প্রামান্যকৃত কুরআন নাকি মহানবী (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন থেকে ভিন্ন রকম। বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি দেয় যে, যেহেতু কুরআনের টেক্সট/ভাষ্য/বয়ান-এ পরিবর্তন করা হয়েছে, তাই সামগ্রিকভাবে এই ঐশী কালামের শুদ্ধতা/যথার্থতা/ত্রুটিহীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। (Introduction to the study of the Holy Quran)। উসমান (রা.) কেন আল কুরআনের একটি স্ট্যান্ডার্ড/প্রামান্য কপি প্রচলন করলেন তার পেছনের ঘটনা বর্ণনা করা দরকার। কারণ, এটাই সেই কুরআন যা কোটি কোটি মুসলমান আজও অধ্যয়ন করে থাকে।

হযরত উসমানের (রা.) খিলাফত কালে আরবের বিভিন্ন গোত্র তাদের নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে কুরআনের শব্দগুলো উচ্চারণ করতো। আর, এরফলে অমুসলিমরা মনে করলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতার মানে হলো কুরআনের টেক্সট/পঠন-এর ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। বস্তুত, বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ ভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই এই 'ভিন্নতার' আপত্তিটি উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। (প্রাগুক্ত)। আরবের বিভিন্ন গোত্রের এই উচ্চারণ পদ্ধতির পার্থক্যের বিষয়টি অনেকেই জানে। যেমন, নজফে যেভাবে 'ক্বাফ' উচ্চারিত হয় মিশরে সেভাবে উচ্চারিত হয় না। সে-যুগে মিশরীয়রা একে 'য' এর মতো করে উচ্চারণ করতো। আসল বিষয় হলো, উচ্চারণের এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শব্দগুলোর অর্থ কিন্তু একই থাকতো, পাল্টে যেত না। (প্রাগুক্ত)। যখন এই গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আরববাসী একই সামাজিক কাঠামোর অধীনে একত্রিত হলো। আর, তাদের পূর্বেকার গোত্রীয় অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করলো। আরবী ভাষা সবার সাধারণ/কমন ভাষায় পরিণত হলো। যেহেতু মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করলো, তখন আরববাসী আরবী শব্দসমূহের সঠিক পদ্ধতিতে উচ্চারণ করাও শিখলো। (প্রাগুক্ত)

উসমান (রা.) বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোনো ধরনের ভিন্নতা, এমনকি কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ভঙ্গির ভিন্নতাও থাকা ঠিক হবে না। তাই তিনি কুরআন পাঠে উচ্চারণের ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন পদ্ধতি রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। (প্রাগুক্ত)। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে সংকলিত কুরআনের কপিটির সাতটি প্রামান্যকৃত/স্ট্যান্ডার্ড অনুলিপি/কপি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ করলেন তিনি। পড়তে জানে এরকম প্রায় সকল মুসলমানের হাতে একটি করে কুরআন মজীদ (প্রামান্য কপি) না পৌঁছানো পর্যন্ত কুরআন শরীফ প্রেরণের কাজটি অব্যাহত ছিল। (প্রাগুক্ত)।

সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা এবং সামাজিক অস্থিরতা

উসমানের (রা.) খিলাফত কালে মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। খলিফা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার কারণেই বেশিরভাগ গোলযোগের সুত্রপাত ঘটেছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ও গুজব প্রচারিত হওয়ার বিষয়টিও উসমানের (রা.) খেলাফত কালে বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এসব গুজবের বেশিরভাগের পেছনেই নব্য মুসলমানদের হাত ছিল, যারা কিনা ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা জ্ঞান রাখতো না। আর, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের শিকারেও তারা সহজেই পরিণত হতো। সহিংসতা এবং অস্থিরতার কারণে মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে ভয়াবহ রকমের খারাপ ঘটনাও সংঘটিত হয়। আসলে, এই সময়টা ছিল ইসলামের ইতিহাসের কলঙ্কিত ও অন্ধকারময় অধ্যায়।

সম্ভবত ২৫ হিজরীতে মুসলমানদের মধ্যে প্রথমবারের মতো মতবিরোধের সূচনা হয়। সাফল্যের সঙ্গে আর্মেনিয়া বিজয়ের পর, হযরত উসমান (রা.) সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)-কে কুফায় পুনরায় গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। সা'দ (রা.) বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত হলে হযরত উসমান (রা.) তাকে অপসারণ করে ওয়ালিদ বিন উকবাহকে সেখানে নিয়োগ করেন। ওয়ালিদ ছিল হযরত উসমানের (রা.) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আস-সাইয়ুতি বলেন:

"... এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যার জন্য মানুষ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ, তিনি তার আত্মীয়-স্বজনদেরকে কর্তৃত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসাচ্ছিলেন।" (Suyuti p. 166)

ওয়ালিদের নিয়োগের ঘটনার পর মানুষ উসমানের (রা.) নিন্দা করে গুজব ছড়াতে শুরু করে। এ বিষয়ে আস-সাইয়ুতি বলেন:

"গল্প আকারে এটি বলা হয়েছে যে, আল-ওয়ালিদ ফজর নামায পড়িয়েছেন চার রাকাত, আর তখন তিনি মাতাল ছিলেন। এরপর তিনি তাদের [নামাযীদের] দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি তোমাদের আরো [রাকাত] পড়াবো?'" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬৬)

গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, গভর্নর একজন মাতাল। এই বিষয়টি খলিফার সামনে পেশ করা হলো। যখন তিনি (হযরত উসমান) শহরে প্রবেশ করলেন এবং ওয়ালিদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, তখন জনগণ হতাশ হয়ে পড়লো। তিনি ওয়ালিদকে কোনো ধরনের শাস্তি প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন; কারণ, এই অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিল না। উসমানের (রা.) এই ইতস্তত ভাবকে মানুষ তার দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে ধরে নিল। আর, কেউ কেউ এটাও ভাবলো যে, খলিফা তার নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করছেন। অবশেষে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এগিয়ে এলেন এবং বললেন, তিনি ওয়ালিদকে মদ বমি করতে দেখেছেন। যাহোক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটি নিয়ে অনেক বিতর্ক করেছেন। যেমন, তাবারি বলেন,

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীটি নির্ভরযোগ্য ছিল না। (History of Islam p. 392-405)। এসব সত্ত্বেও, অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর হযরত উসমান (রা.) ওয়ালিদকে চাবুক মারার এবং বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মিশরে পরিবারের আরেকজন সদস্যকে সম্মানজনক পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তও একইরকম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখিন হলো। হযরত উসমানের (রা.) পালক ভাই (তার বাবা-মার কাছে প্রতিপালিত ব্যক্তি) আবদুলাহ বিন সা'দকে (রা.) মিশরে গভর্নর করে পাঠানো হয় এবং কোষাগারের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। যদিও তিনি সাহসিকতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তথাপি আমর বিন আল আস-এর (রা.) স্থলে তাকে নিয়োগ করায় মিশরীয়দের মধ্যে কেউ কেউ হতভম্ব হয়ে যায়। আমর বিন আল আসকে (রা.) শুধু সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে রাখা হলো। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)। আবদুলাহ বিন সাদের চেয়ে আমর বিন আল আস অনেক বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং মিশরীয়দের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় ছিলেন।

খলিফা আমর বিন আল আসকে পদচ্যুত করায় এবং তদস্থলে আবদুলাহ বিন সাদকে নিয়োগ করায় মিশরবাসী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট হলো। অধিকন্তু, আমর (রা.) যখন পদচ্যুত হলো এবং এই সংবাদ যখন কনস্ট্যান্টিনোপলে সিজারের কাছে পৌঁছুলো, তখন সিজার এক অভিজ্ঞ জেনারেলের নেতৃত্বে একটি দুর্ধর্ষ সেনাদল প্রস্তুত করা শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম-অধ্যুষিত আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করা। এসব ঘটনার ফলে মুসলমানরা এতোটাই ক্ষিপ্ত হলো যে, তা নতুন গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হলো। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)

এরপর আমরকে (রা.) মিশর শাসনের দায়িত্ব দিয়ে ফেরত পাঠানো হলো। তিনি অগ্রসরমান রোমানদেরকে পরাজিত করলেন এবং তাদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য করলেন। আমরের স্থলে একবার আবদুলাহ বিন সাদকে গভর্নর করা সত্ত্বেও, এই ঘটনার পর আলেকজান্দ্রিয়া ও মিশরে তুলনামূলকভাবে শান্তিময় পরিস্থিতি বিরাজ করতে লাগলো।

এদিকে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদ বিন আবু হুজাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকর খোলাখুলিভাবে খলিফার বিরোধিতা করা শুরু করলেন। একদা রাসূলুলাহ (সা.) আবদুলাহ বিন সাদ-এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও উসমান তাকে গভর্নর হিসেবে বেঁছে নেওয়ায় মুহাম্মদ বিন আবু হুজাইফা এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকর অগ্নিশর্মা হলেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)

ইসলামী সেনাদলগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়ী হতে থাকলেও এর কিছু কুপ্রভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সৈনিক জীবনের কাঠিন্য তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে তুলছিল। সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছিল। কারণ, তাদেরকে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে লড়াই করতে হতো। এছাড়া, পরিবার-পরিজন ছেড়ে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করার কষ্ট তো ছিলই। উপরন্তু, কমান্ডারদের এবং মক্কার ধনী ব্যক্তিদের ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্যক্তিগতভাবে ভূমির অধিকারী হওয়ার অনুমতি ছিল না। হযরত উসমানের এই নীতির কারণেও তারা অসন্তুষ্ট হয়। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)

একইভাবে, গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে তার পছন্দসমূহ এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের কারণে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ৩৩ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে কুফাতে নব-নিয়োজিত গভর্নর সাইদ বিন আল-আস (রা.)-এর দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফলে নাগরিক-অস্থিরতা বিস্তৃত হয়। যখন সাইদ (রা.) এই বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেন, তখন বিদ্রোহীরা তাকে প্রহার করে অচেতন করে ফেলে। ফলে, এই অবাধ্যতা দমনে এবং পরিস্থিতি শান্ত করতে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)।

কিন্তু, এর ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে, জনগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর, গভর্নরের বিরোধিতা তখন খলিফার বিরোধিতায় পরিণত হয়। জনগণ রাস্তায় নামে। যাহোক, উসমান (রা.) বিদ্রোহীদেরকে হিমস্ -এর গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। গভর্নর তাদেরকে শান্ত করতে সক্ষম হন। এরপর তারা কুফায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯২-৪০৫)

১৪০০ বছরেরও বেশি সময় পরে এসব অশান্তিময় ঘটনার মোটিভ এবং এসবের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সহজ কাজ নয়। তবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের একটি অংশ অসৎ উদ্দেশ্যে খলিফার সমালোচনা করার জন্য যে-কোনো রকমের ছুতো খুঁজছিল। যেমন, মদিনার মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়েছিল; কারণ, উসমান (রা.) সেই শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ তার নিজের উমাইয়া পরিবারের সদস্যদের প্রদান করেছিলেন। তারা এই সম্ভাবনাটি উপেক্ষা করেছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে নয়, উসমান হয়তো তাদের মেধা ও যোগ্যতার জন্যই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

Karen Armstrong এই বিষয়টি সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন, গর্ব ও ঔদ্ধত্বের বশবর্তী হয়ে এই মুসলমানরা উসমানের বিরোধিতা করেছিল। তিনি বলেন:

"তারা তাকে স্বজন-প্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, যদিও উমাইয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল। 'যেমন, মুহাম্মদের পুরোনো শত্রু আবু সুফিয়ানের ছেলে মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করেন উসমান। মুয়াবিয়া ভালো মুসলমান ছিল, সে দক্ষ প্রশাসকও ছিল।

চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য এবং পরিস্থিতি নিরূপণের ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার জন্যও সে সুপরিচিত ছিল। কিন্তু, মদিনার মুসলমানদের চোখে এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে হলো। রসূলের সাহায্যকারী [আনসার] হওয়ার সুবাদে তখনো অহঙ্কার পোষণ করতো আর নিজেদেরকে আবু সুফিয়ানের ছেলের চেয়ে বেশি আনুকূল্য লাভের অধিকারী বলে মনে করতো।" (Introduction to the Study of the Holy Qur'an)

[The Review of Religions, December 2007 অবলম্বনে]

(চলবে)

আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকারীর জন্য প্রত্যেক দিনই ঈদ

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রতি বছর ঈদ আসে ঈদ যায় কিন্তু আমাদের মাঝে কি পরিবর্তন আসে তা সবার দেখার বিষয়। ঈদ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে কিন্তু তার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হয় নি, সেক্ষেত্রে তার অন্তর মৃত। আর যে ঈদের নামায পড়ে নি এবং তার অন্তরে ইসলামের দরদও সৃষ্টি হয় নি, সে ব্যক্তির অন্তরও মৃত। তেমনি যে ব্যক্তি ঈদ উদযপান করলো না তার অন্তরও মৃত। প্রকৃত ঈদ সে ব্যক্তিরই হবে, যে স্ববিরোধী আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ঈদ উদযাপন করে, তার অন্তর বিলাপ করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা ঈদ উদযাপন করে।

আমাদের প্রকৃত ঈদ তখনই হাসিল হবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম বিস্তার লাভ করবে, যখন মসজিদ আল্লাহ্‌র স্মরণকারীতে ভরে যাবে এবং যখন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং কুরআন করীমের সত্যিকার শাসন দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছে যাবে। ....আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ঈদ তখনই হবে যখন ইসলাম পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠতে শুরু করবে। (ঈদুল ফিতরের খুতবা, ৭ জুলাই, ১৯৪৮)

সারা মুসলিম জাহানে সিয়াম-সাধনা এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আলাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বান্দা তার অতীতের সকল ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে এ প্রশিক্ষণলব্ধ আমলে সালেহ যথাযথ কাজে লাগিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হওয়ার এক সফল অনুষ্ঠান এ পবিত্র ঈদ। যে আনন্দ বিশ্ববাসীর মাঝে বার বার ফিরে আসে তাকেই ঈদ বলা হয়। ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহুপূর্ব থেকে মর্ত্যবাসীদের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি ও ধর্মের অনুসারিরা নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। তবে ইসলাম ধর্মেই কেবল মাত্র ঈদকে সার্বজনীন ইবাদত রূপে রূপায়ন করা হয়েছে।

ঈদ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলে করীম (সা.) মদিনাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান, সেখানের অধিবাসিরা বছরে দু'টি দিন (পায়মুক ও মিহিরজান) খেলা ধূলা ও আনন্দ উৎসব করে। হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন এ দু'টি কিসের দিন? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, জাহেলিয়তের যুগে আমরাও এ দু'টি দিনে খেলা ধূলা ও উৎসব পালন করতাম। হুযূর (সা.) এ কথা শুনে বললেন, 'আলাহ্‌পাক তোমাদেরকে এ দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দু'টি উত্তম দিন প্রদান করেছেন। আর তাহলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা' (আবুদাউদ, তিরমিজি)।

আর কয় দিন পরেই আমরা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে ঈদ পালন করতে যাচ্ছি। ঈদ আমাদেরকে এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। আমরা যদি সর্বদা এই চিন্তা করি যে, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই খোদা তাআলার নির্দেশমত চলতে হবে। আর এ শিক্ষাই কিন্তু আমরা রমযানের রোযা আর ঈদ থেকে লাভ করি।

এক মাসের রোযা এবং ঈদ দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা এক মাস রোযা রাখি তারপর ঈদ উদযাপন করি, এসব কিন্তু আমরা আলাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরেই করে থাকি। খোদা তাআলার কৃপা হলে ক'দিন পর আমরা সবাই ঈদ উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবো। এই যে ঈদ উদযাপন করবো এটাও কিন্তু আলাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই আমরা করবো।

ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসলিম মিলাতের জন্য একটি বিশেষ রহমত ও আলাহ্‌র দেয়া আদেশ। যার মাধ্যমে আমরা আলাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। অন্য কথায় ঈদ হলো তাকওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক। বলা যায় আলাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তা-ই প্রকৃত ঈদ। যারা পবিত্র মাহে রমযানের সারা মাস রোযা রেখেছে এবং অন্যান্য ইবাদত গভীর মনোনিবেশ সহকারে করেছে তাদের জন্যই ঈদ প্রকৃত আনন্দের আর এই ঈদ ইবাদতের।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৩ অক্টোবর ২০০৭ মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদানকালে এক স্থানে বলেন-

"আল্লাহ্ তাআলার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। এক মাস রোযা আমরা আমাদের তাক্‌ওয়াকে ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য রেখেছি।

আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি–যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্‌ওয়া বাড়ানোকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর, এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তাআলা আজ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব কর। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা কর। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পড়, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নেই।

কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো –মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ, এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর। এ ঈদ হাসি খুশি, রং তামাশা, খাওয়া দাওয়া ও বন্ধুদের সাথে মজা করার নাম নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরিপূর্ণ আনুগত্যে সমস্ত বৈধ বিষয় থেকে এক মাস বিরত থাকার পর আল্লাহ্‌র আদেশে আবার সেগুলো চালু করার নাম। আমাদের ঈদগুলো যেন আমাদেরকে ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়- যে ইবাদতের ও ত্যাগের স্বাদ আমরা লাভ করেছি আর যার ফলশ্রুতিতে আজ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বিবি বাচ্চা ও জামা'তের সদস্যদের সাথে মিলে আনন্দ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এই ত্যাগ ও ইবাদতকে যেন আমরা চিরস্থায়ী করে নেই। যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিটি দিন রোযার ঈদ হয়ে উদিত হয়।

এ ঈদ যা আমরা পালন করছি, এটা এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। সর্বদা এটা আমাদের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত রাখা উচিত, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা এটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষা আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা রোযা রাখি, ঈদ উদযাপন করি, সবই আল্লাহ্‌র আনুগত্যেই করে থাকি। আজ যে ঈদ উদযাপন এটাও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই।...

আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে। সুতরাং আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া উচিত।

তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন চকলেট ইত্যাদি না খায়। সাথে সাথে গরীব বাচ্চা যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাষার্ত রয়েছে তাদের প্রতিও যেন তারা খেয়াল রাখে।"

মুসলমানের জন্য ঈদ একটি মহা ইবাদত। ঈদের ইবাদতে শরীয়ত নির্দেশিত কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা পালনে সামাজিক জীবনে পারস্পরিক আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও বন্ধন সুসংহত হয়। ঈদুল ফিতরের শরীয়ত দিক হলো, ঈদের নামাযের পূর্বে রোযার ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় করা, ঈদ গাহে দু' রাকাত নামায আদায় করা, খুতবা শুনা এবং উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা।

ঈদের মাধ্যমে আমাদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে আর পরস্পরের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি এমনটা হয় তাহলেই আমাদের এ ঈদ পালন ইবাদতে গন্য হবে। যারা খেলা ধূলা ও আনন্দ উৎসবে মেতে দিন অতিবাহিত করে তাদের জন্য এ ঈদ জীবনে কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে না। তাদের জন্য ঈদ একটি আনন্দ মেলা বৈ কিছু নয়।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লন্ডনে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদানকালে বলেন-

"ঈদের দিনেও খোদা তাআলার আনুগত্যের খেয়াল রাখা আবশ্যক। পুণ্য লাভের যে চেষ্টা আমরা রমযানে করেছি তাই আজ তাকবীরের মাধ্যমে আবার বলছি, খোদা তাআলার মহান ও মহানুভবতা অনুধাবনের মাধ্যমে সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যকারী হয়ে যাবে, তার প্রত্যেকটি দিনই ঈদ হবে। প্রকৃত ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পুত পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ওপর কর্ম সম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পুতপবিত্রতা চিরস্থায়ীভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে।

আজ রমযানকে ভুলে যাওয়ার দিন নয় বরং তা স্মরণ রাখার অঙ্গীকার করতে হবে, তাহলেই আমাদের ঈদ কল্যাণময় ঈদ হবে। আমাদের রমযান কল্যাণমন্ডিত রমযান হবে। আর এ ঈদ আমাদের ইহকাল ও পরকাল সজ্জিত করার ঈদ হবে।"

তাই আমাদের এ ঈদ উদযাপন যেন কল্যাণময় ও ইবাদতে পরিণত হয় এ দোয়াই আমাদের করা উচিৎ। আর কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আলাহ্ তাআলা আমাদেরকে ঈদ দান করেছেন। আমাদের এতে বেশি বেশি খোদার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আমাদের এ ঈদ তখনই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দ হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যাথা অনুভব করে, এক দলবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য চেষ্টা করবো। যার ফলে এ ঈদ মহা ইবাদতে রূপ লাভ করবে।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে ঈদ উদযাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

ঈদ আল্লাহ্‌র শোকরানা আদায় করার নাম

এনামুল হক রনী

ঈদ কি? ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। মুসলমান হিসাব বছর ঘুরে আসে আমাদের এমন দু'টি আনন্দ উৎসব বা ঈদ। আর তা হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। একটি আসে পবিত্র মাহে রমযানে রোযা পালনের মাধ্যমে আর অপরটি আসে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কুরবানীর স্মৃতিরূপে পশু কুরবানীর মাধ্যমে। আমাদের প্রতিটি ঈদই আল্লাহ্‌র শোকরানা স্বরূপ আদায় করা হয়ে থাকে। মুসলমান মাত্রই তাদের সকল আনন্দ খোদার সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। তাই মুসলমান খোদার সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ পেলে শোকরানা আদায় করে থাকে। ঈদ আমাদের সেই শোকরানা আদায়ের সুযোগ করে দেয়। তাই সকলে মিলে-মিশে শোকরানা স্বরূপ দু'রাকাত নামাযের মাধ্যমে ঈদ পালন করে থাকি।

ঈদুল ফিতর : আল্লাহ্ পাকের খাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের একমাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে যে ঈদ আসে তা হলো ঈদুল ফিতর। হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে ইফতার কর (অর্থাৎ রোযা শেষ করো) বা ঈদ করো। একজন রোযাদারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো এই যে, খোদা তাআলার আদেশ অনুযায়ী মাসব্যাপী রোযা রাখতে আল্লাহ্ তাকে তৌফিক দিয়েছেন। এ খুশি প্রকাশ করতেই রমযান মাস শেষ করে শাওয়াল মাসের ১লা তারিখে ঈদের আনন্দে মিলিত হয়। এখন আল্লাহ্ পাক তাদের সকল বৈধ খাবার ও পানীয় ও কাজ কর্ম যা কিনা রোযার কারণে বিরত রেখে ছিলেন আজ থেকে সব অনুমতি প্রদান করা হলো। তাই এই ঈদ ঈদুল ফিতর বা রোযা খোলার ঈদ।

ঈদের চাঁদ: মুসলমানদের জন্য ঈদের চাঁদ অত্যন্ত আনন্দের মহূর্ত। কারণ চাঁদের হিসাবেই ঈদ পর্ব শুরু হয়। রমযান মাসের শেষ দিন মুসলমান মাত্রই হোক সে বৃদ্ধ, যুবক কিংবা শিশু, চাঁদ দেখা বা চাঁদের খবর নিতে উৎসুক দেখা যায়। আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) ও এই চাঁদ দেখে দোয়া করতেন, **"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনে ওয়াল ঈমানে, ওয়াস্ সালামাতে, ওয়াল ইসলামে, রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহু হিলালুর রুশদিউ ওয়া খাইর"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এই চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) তোমার ও আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ্। হে আল্লাহ্ এ চাঁদ যেন সঠিক পথের ও কল্যাণের চাঁদ হয়। (ইমাম তিরমিযী) আমরাও নতুন চাঁদ দেখে এ দোয়া করে থাকি।

ঈদের তাকবীর: ঈদের চাঁদ দেখার পর (অর্থাৎ শাওয়ালের চাঁদ) তাকবীর পড়তে হয়–আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। এই তাকবীর ঈদুল ফিতরের সময় চাঁদ উঠার পর থেকে ঈদের পরের দিন আসর পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার সময় যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর হতে ১৩ তারিখ আসর নামায পর্যন্ত উচ্চস্বরে কমপক্ষে ৩ বার করে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর পাঠ করতে হয়। এছাড়া ঈদের নামায পড়ানোর পর ইমাম সাহেব পাঠ করতে থাকে আর ঈদ পড়তে যাওয়ার সময় ও আসার পথে এ তাকবীর পাঠ করা উচিত।

ঈদের পূর্বে ফিতরানা : ঈদের পূর্বে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, শিশু এমনকি সদ্য জন্মলাভকারী শিশুর জন্য জামা'ত কর্তৃক নির্ধারিত ফিতরানা আদায় করা জরুরী। ফিরানার টাকা দিয়ে গরীব, অসহায় দুঃস্থগণ অন্যান্যদের সাথে ঈদের আনন্দ করে থাকে। যেহেতু ফিতরানার টাকা দিয়ে দুঃস্থ অসহায়গণ ঈদ করে তাই ঈদের কিছুদিন পূর্বে এই টাকা আদায় করা সবচেয়ে উত্তম। আমাদের জামা'তে এসব যথাযথ আদায় ও বিতরণ করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

ঈদে যাওয়ার প্রস্তুতি : ঈদের অনুষ্ঠান সাধারণত মাঠে (খোলা আকাশের নীচে) অথবা জামে মসজিদে হয়ে থাকে। খুব ভোর হতে ছোট ছোট শিশুরা নতুন নতুন জামা কাপড় পড়ার জন্য গোসল করে ও খুশবু লাগিয়ে ঈদগাহে রওনা হয়। আমাদের প্রিয় রাসূল ঈদগাহ যাওয়ার জন্য ভিন্ন রাস্তা ও ফিরে আসার জন্য ভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করতেন যেন অনেক বেশী লোকের সাথে সাক্ষাৎ-এর সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সম্ভব হলে নতুন পোশাক পরিধান করে ঈদগাহে উপস্থিত হতে হয়।

ঈদ ফান্ড আদায় : ঈদের দিনে ঈদের আনন্দ ও খুশিতে আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলাম প্রচার কল্পে প্রত্যেকে সাধ্যমত ঈদ ফান্ড আদায় করতে হয়। এই খাতের অর্থ (টাকা-পয়সা) ১০০% ইশায়াতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচারের খাতে ব্যায় হয়ে থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে ঈদের আনন্দে যেন আমরা সারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজের কথা ভুলে না যাই। তাই কিছুটা হলেও এ কাজে শরীক হওয়ার জন্য শিশুদের পর্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

ঈদের তোহফা : পবিত্র ঈদ উপলক্ষে ঈদী বা ঈদের উপহার বিতরণ করা মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে আসছে। ঈদের খুশিতে আত্মীয়-অনাত্মীয় পরস্পরকে তোহফা বিনিময় করে থাকে এটা একটি ভাল রীতি। এতে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়। কাপর-চোপড়, দ্রব্যাদি, টাকা-পয়সা ঈদের তোহফা হিসাবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। অনেকে তৈরী খাবার, মিষ্টি বিতরণ করে থাকে। জামা'তের সদস্যগণ অনেক সময় বাড়ী বাড়ী ঘুরে কুশলাদি বিনিময় করে থাকেন। জামা'তের সকল সদস্যদের প্রতি আমাদের প্রিয় হুযূর আকদাস (আই.) ঈদ মোবারকের তোহফা প্রদান করে থাকেন।

ঈদের নামায : ঈদের নামাযের মাধ্যমেই ঈদের প্রকৃত আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ঈদের সকল প্রস্তুতি মূলত: আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে শোকরানা স্বরূপ দু'রাকাত নামায পড়ার মাধ্যমে। সকালের দিকে খোলা মাঠে অথবা মসজিদে এই দু'রাকাত নামায আদায় করতে হয়। ঈদের নামাযে আযান ও আকামত নেই। তবে সর্বমোট ১২টি তাকবীর আছে প্রথম রাকাতে সূরা কারাত শুরু করার পূর্বে ৭টি তাকবীর আল্লাহ্ আকবার বলতে হয় তারপর যথারীতি ১ম রাকাত পুরা করে ২য় রাকাতের শুরুতে ৫টি তাকবীর দিয়ে যথারীতি নামায শেষ করে খুতবা প্রদান করতে হয়। খুতবা শেষ হলে ইজতেমায়ী দোয়া করে সবাই মোলাকাত করতে থাকে। ঈদ আনন্দে সকলে বুকে বুকে মিলে একাকার হয়ে যায়।

ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য মূলত: খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করে তাঁরই ইবাদতের মাধ্যমে শোকরানা আদায় করে এটাকে বাস্তবে প্রকাশ করা। তাই এই আনন্দ শুধু খুশি বা মজার জন্য নয় বরং আপন প্রভুর বান্দা হিসাবে স্থায়ীভাবে ইবাদত প্রতিষ্ঠায় রত থাকা। আমরা যেন ঈদের আনন্দে খোদার সন্তুষ্টিতে সর্বদা জীবনের জন্য স্থায়ী ইবাদত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সদা সর্বদা তাঁর শোকরানা আদায় করার তৌফিক দিন, আমীন।

লেখক : **মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ**

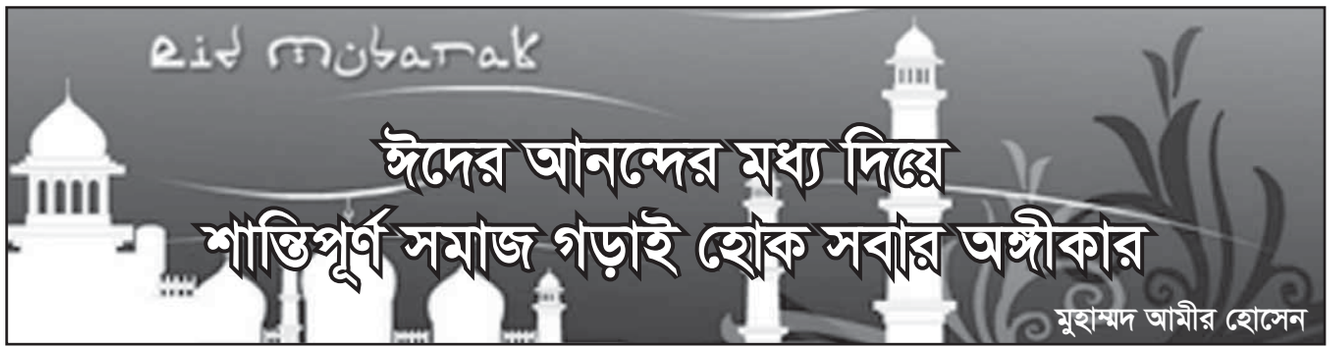

ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়াই হোক সবার অঙ্গীকার

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ঈদ শব্দটির সাথে আমরা ছোট বড় সবাই পরিচিত। ঈদের কথা শুনলে সবার মাঝে কেমন যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ছোটরা বুঝুক আর না বুঝুক তারা মনে করে এ দিনটি আনন্দের, খুশীর ও উৎসবের। এদিনে নতুন জামা কাপড়ে সাজবে ও ভাল ভাল সব খাবার খাবে। ঈদ মানে কি আসলে তাই!

ঈদ শব্দটি 'আওদ' থেকে উদ্ভূত। ঈদ এর অর্থ আনন্দ, খুশি, আমোদ, আহ্লাদ উৎসব ইত্যাদি। আওদ অর্থ ফিরে আসা, পুন:পুন: আসা। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বার বার আসে। মু'মিন মুসলমানের জন্য ঈদের দিন অত্যন্ত পুণ্যময়, এদিন ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই বিশেষ আনন্দের দিন মুসলমানদের জীবনে বছরে দু'বার এসে থাকে। আর তা ফিরে ফিরে আসে। তাই শব্দটি 'আওদ' হতে উদ্ভূত। প্রতি বছরে বার বার এই ফিরে আসা দু'টি বিশেষ উৎসবকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'ঈদ' বলা হয়। এর একটি হলো 'ঈদুল ফিতর' এবং অন্যটি 'ঈদুল আযহা'।

ঈদের দিন এমন একটি দিন যা অন্য দিন থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এদিন বিশ্ব-মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে যায় এবং ঈদের মাঠে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, আমীর-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে বিশেষ ইবাদত করে থাকে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রিয় ও সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বিশেষ কিছু বরকত ও কল্যাণকর অনুষ্ঠান প্রদান করেছেন, যা অন্য কোন নবী রাসূল লাভ করেনি। তন্মধ্যে নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অনুষ্ঠান হলো ঈদ।

বিশ্ব মুসলিম জাহানের একটি বার্ষিক সম্মেলন উৎসবের দিন ঈদ। ঈদের দিনে দু'রাকাত ওয়াজিব নামায আদায়ের লক্ষ্যে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে সকল ভেদাভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে একত্রে ঈদের নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এই ঈদের আনন্দে ঈদের পরশে ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-ভালবাসার স্বর্গীয় বন্ধনে নিজেদেরকে বেঁধে নেয়া উচিত। এই আনন্দ শুধুমাত্র নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আমাদের চার পাশে যে গরীব মিসকিন ও অসহায়রা বাস করে তাদের প্রতিও খেয়াল রাখা কর্তব্য। প্রত্যেক বিত্তবানদের উচিত নিজেদের কেনাকাটার পাশাপাশি এই অসহায়দেরকেও কিছু সাহায্য সহযোগিতা করা। তবেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ সার্থক হবে।

মুসলমানরা খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং কুরআনের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে, তারা পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা আর কঠোর সংগ্রাম ও কৃচ্ছতা সাধন শেষে রোযাদারদের যে আনন্দ হয় তা নবী করীম (সা.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ রোযাদারদের জন্য দু'টি আনন্দ, এক যখন সে রোযা ভঙ্গ করে অর্থাৎ ইফতারের সময় এবং দুই তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী ও মুসলিম), মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে আত্মনিবেদনের পর একে অন্যের সাথে বুকে বুক মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে অন্যান্য সুযোগ লাভের সময় সমাজের গরীব দুঃখীকে সদকা, ফিতরা এবং কুরবানীর মাধ্যমে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা-ই দুনিয়াকে বেহেশতের বাগানে পরিণত করে। আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে আহমদীয়া জামা'ত এক খলীফার আনুগত্যের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করে থাকে। ঈদের পূর্বেই গরীবদের মাঝে সাধ্যমত ঈদের তোহ্ফা ও সাহায্য বিতরণ করা হয়ে থাকে যাতে তারা সকলের সাথে ঈদের খুশীতে শরিক হতে পারে।

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দুনিয়া হলো মু'মিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য বেহেশ্‌ত। (মুসলিম)।

সুতরাং একজন মু'মিনের জন্য ক্ষণিকের এই আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নয়। মু'মিন এই দুনিয়াতে নানাবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের জীবনের মাঝে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করবে এবং তার ফজিলতে পরকালে এক আনন্দ জীবন লাভ হবে আর সেটাই হবে প্রকৃত ঈদ বা আনন্দ যা জান্নাত আকারে একজন মু'মিন লাভ করবে।

ঈদ উৎসবে কে কত দামী দামী এবং সুন্দর পোশাক পড়লো বা কে কত উন্নত মানের খাবার খেতে পেল সেটা কখনো বিবেচ্য বিষয় নয়, বরং বিষয় হচ্ছে নিজ আত্মাকে কে কতটুকু নিষ্পাপ রাখতে পেরেছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ত্যাগ স্বীকার করে তার নৈকট্য লাভে কে কতটা ধন্য হয়েছে।

ঈদের নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদ আসে বিশ্ব মুসলিমের দ্বারপ্রান্তে বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে , তাকে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে, সেই ঈদকে যথার্থ মর্যাদায় উদযাপন করা এবং ঈদের নামায যথাযথভাবে আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পর প্রীতির ডোরে আবদ্ধ হয়ে ঈদের আনন্দের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবশ্য কর্তব্য।

ঈদগাহে যাওয়ার পথে ও ঈদের নামাযের পরে নিম্নোক্ত তকবীরটি পাঠ করা উচিত। –আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। অর্থ : আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে গরীব দু:খীদের সাথে নিয়ে প্রকৃত ঈদের আনন্দ উপভোগ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক : মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মুরিদ না হলেও তাঁর (আ.) মহান চরিত্রের সত্যায়নকারীদের ক'জন

মোজাফফর আহমদ রাজু

নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অনেক বেশী স্মরণ করে (সূরা আহযাব)।

এই আয়াতে নবীদের সেরা ও সরদার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করা হয়েছে। ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও সোনাতন ধর্মের বড় নেতা ও লেখকগণ মহানবী (সা.)-এর জীবন ও বিপ্লবকে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। আখেরী যামানায় আগমনকারী মাহদী মাওউদ (আ.) যেহেতু মহানবী (সা.)-এর চাকর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন সেজন্য তাঁর (আ.)-ও প্রশংসার ফিরিস্তি তার বিরুদ্ধবাদীরাসহ সমযুগের আলেম ও লেখকগণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করবেন। পাঠকদের দরবারে এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি।

১. ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমদের একজন, পাঞ্জাব প্রদেশে প্রকাশিত উকিল পত্রিকায় প্রকাশিত হযরত মৌলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবের অভিমত যা ২০ জুন ১৯০৮ সনে বলা হয়। 'তিনি হযরত গোলাম আহমদ (আ.) এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিষ্ক মুর্তিমান বিস্ময় ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কেয়ামত সদৃশ। তাঁর আঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হত। তাঁর দু'টি মুষ্টি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল। তিনি ত্রিশ বছর যাবত ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষান হয়ে নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করতেন। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন।" ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন–তাঁর এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। খৃষ্টান ও আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করেছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। আজ যখন তাঁর এই মহান লিটারেচার স্বীয় কার্যকারিতা পূর্ণ করেছে তখন এর মর্যাদা ও মাহাত্মকে অন্তরের অন্ত:স্থল হতে আমাদের স্বীকার করতে হয়।.... হিন্দুস্থানের ধর্মীয় জগতে ভবিষ্যতে আর এরূপ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্ম লাভ করবেন বলে আশা করা যায় না। তাঁর সেই মহান আন্দোলন যা আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবত বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। তা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে–এটাই আমাদের আশা ও আকাঙ্খা।"

২. অল ইন্ডিয়া ক্রিশ্চান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মি: ওয়াল্টার, এম, এ, তাঁর প্রণীত পুস্তক 'আহমদীয়া মুভমেন্ট'-এ লিখেছেন : "এটা সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে, মির্যা সাহেব স্বীয় স্বভাব গুণে সরল ও উদার এবং মহানুভব ছিলেন। তেমনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে পরিচালিত কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় তিনি যে তাঁর নৈতিক বল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সন্দেহাতীতরূপে প্রশংসনীয়। একমাত্র আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিই সেই সকল লোকের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়, যেরূপ কমপক্ষেও তাঁর মান্যকারী দু ব্যক্তি-আফগানিস্তানে নিজেদের আকিদার উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন–তথাপি মির্যা সাহেবের অঞ্চল পরিত্যাগ করেন নি। আমি প্রবীন আহমদীদের কয়েকজনকেই তাদের আহমদী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের বেশির ভাগই মির্যা সাহেবের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ও আকর্ষণ শক্তি এবং চুম্বক-সুলভ ব্যক্তিত্বকেই এর প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। মির্যা সাহেবের মৃত্যুর আট বছর পরে ১৯১৬ সনে আমি কাদিয়ানে গিয়ে এরূপ এক জামা'ত দেখতে পাই, যাদের মধ্যে ধর্মের জন্য সত্যিকার ও শক্তিশালী উদ্যম ও উদ্দীপনা বিরাজমান, যা হিন্দুস্থানের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আজ পরিলক্ষিত হয় না। কাদিয়ানে গিয়েই মানুষ আজ এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, একজন মুসলমান ঈমান ও মহব্বতের যে রূহ্ তা সে একমাত্র আহমদের জামা'তের মধ্যে পর্যাপ্ত ও বিপুল পরিমাণে পাবে।"

৩. দিল্লীর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ১লা জুন ১৯০৮ সনে লিখেছেন : "আর্য সমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ) যে ইসলামী খেদমত করেছেন, তা বস্তুত:ই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় বাকতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন এবং হিন্দুস্থানে এক নতুন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করেছেন। একজন মুসলমান হিসেবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করছি যে, কোন বড় হতে বড় আর্য সমাজী বা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তার মুখ খুলে। যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয়, বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁর পর্যায়ে শক্তিশালী লেখক নাই। তাঁর রচনা নিজ শানে সম্পূর্ণ অপূর্ব এবং বস্তুত: তাঁর কোন লেখা পড়লে আত্মবিভোর হতে হয়। তিনি কঠোর বিরুদ্ধাচরণ এবং কুটসমালোচনার অগ্নিসাগর পার হয়ে আপন পথ পরিষ্কার করছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছিলেন।" প্রতিবেশির সত্যায়ণ মূলত: ও প্রকৃতপক্ষেই ব্যক্তির জন্য মহান এক সনদ যা উল্লেখিত আলোচনায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪. এলাহাবাদ হতে ইংরেজী পত্রিকা পাইওনিয়ার ৩০ মে ১৯০৮ সনের অভিমত নিম্নরূপ : "স্বীয় দাবীর ক্ষেত্রে মির্যা সাহেবের কখনও সামান্যতম সন্দেহ ছিল না এবং তিনি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন যে, তাঁর উপর আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হয় এবং তাঁকে এক অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দান করা হয়েছে। একবার তিনি তাঁর মোকাবেলার নিদর্শন দেখাবার জন্য বিশপকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলে। এতে বিশপ হতভম্ভ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মির্যা সাহেব স্বয়ং নিদর্শন দেখাতে প্রস্তুত ছিলেন।"

৫. সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেব সম্পাদক "তাহযিবে নেসওয়া লাহোর" ১৯০৮ সনে লিখেন : "মির্যা সাহেব মরহুম অত্যন্ত পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁন নেকীতে এক শক্তি ছিল যে, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দিত। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী আলেম, শক্তিশালী সংস্কারক এবং তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ ছিল। আমরা তাঁকে "মসীহ্ মাওউদ" মানি না, কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথনির্দেশ মৃত আত্মাসমূহের জন্য প্রকৃতপক্ষে মসীহা ছিল।"

৬. মৌলভী জাফর আলী খান পাক-ভারতের একজন নামকরা মুসলমান নেতা এবং "জমিদার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পিতা মৌলভী সিরাজউদ্দিন সাহেব ৮ জুন ১৯০৮ সনে জমিদার পত্রিকায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্বন্ধে বলেন, "মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে জেলা শিয়ালকোর্টে চাকুরীরত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ২২-২৩ বছর হবে। আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ (সৎকর্মপরায়ণ) এবং মুত্তাকী (খোদা ভীতি ও প্রেমিক) বুযূর্গ ছিলেন।" উক্ত ব্যক্তিবর্গের কলমকে আল্লাহ্ চালিয়েছেন

তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের সত্যতার নিদর্শন রূপে।

৭. মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী একজন বিশিষ্ট আলেম এবং আহমদী বিরোধী নেতা ছিলেন। তিনি এশায়াতুস সুন্নাহর ৭ম খন্ড ৯ম সংখ্যায় লিখেছেন : "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক আমাদের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরীয়াতে মোহাম্মদীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেজগার ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।.....।"

৮. "মাশরিক" পত্রিকার সম্পাদক আহমদীয়া জামা'তের একজন ঘোর বিরোধী হওয়া সত্বেও তিনি তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জামা'তের প্রশংসা করেছেন যা ৮ই জুলাই ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়েছে : "আমরা এটা পূর্বেই লিখেছি এবং এখনও নি:সঙ্কোচ ও দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, বর্তমানে আহমদীগণ যেভাবে ইসলামের সত্যিকার খেদমত করছেন, তা হতে উৎকৃষ্টতম খেদমত অপর কোন ফেরকা বা দল কর্তৃক সাধিত হচ্ছে না। সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য বটে, কিন্তু কেবল আহমদীয়া জামা'তই এর কার্যক্ষেত্রে সফলকাম হচ্ছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের সনদ প্রয়োজন নেই, কিন্তু খোদার প্রেরিত মা'মুরকে দুনিয়াতে এভাবেই অন্যান্য জাতির কলম দিয়ে প্রশংসা করিয়ে সত্যতার সাক্ষ্য বহন করাবেন। বিবেকবানদের সত্যকে গ্রহণের জন্য।

৯. "লায়েলপুর (পাকিস্তান) হতে প্রকাশিত আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী সাপ্তাহিক পত্রিকা আল্-মিম্বার ১০ আগষ্ট ১৯৫৬ সনে সম্পাদক সাহেব তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেন: "কাদিয়ানী মতবাদের মধ্যে হিতকর কাজে যে নিপুনতা রয়েছে, এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের সেই মহান প্রচেষ্টা, যা তারা ইসলামের নামে যে প্রচারকার্য বহির্দেশে পরিচালনা করছে। তারা বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় কুরআন শরীফ তরজমা করে বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করছে, ত্রিত্ববাদের মতবাদ খন্ডন করছে ও বিদেশে মসজিদ নির্মাণ করছে এবং যে স্থানেই সম্ভব ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মরূপে উপস্থাপিত করছে।" যে ব্যক্তি সারা জীবন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর দাবীর ও জামা'তের বিরোধিতা করলেন তিনি উক্ত লেখনিতে যে সনদ দিলেন বিশ্বাবাসীর জন্য তা তো একজন মহা পুরুষের সত্যতারই সাক্ষ্যবহণ করে।

১০. আহমদীয়া মতবাদের ঘোর বিরোধী মিশরীয় পত্রিকা "আল্ ফাতাহ্"-এর সম্পাদক সাহেব তাঁর সম্পাদকীয়তে কায়রো হতে প্রকাশিত জমাদিয়ূস-সানি, ১৩৬১ হিজরী লিখেছেন : আমি যখন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করলাম, তখন কাদিয়ানীদের আন্দোলনটিকে বিস্ময়কর পেলাম। তারা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে বিভিন্ন ভাষায় তাদের আওয়াজ উর্দ্ধে তুলে ধরেছে।" অত:পর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচার কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে প্রশংসামূলক বক্তব্য রেখে তিনি বলেন–"আহমদীরা খৃষ্টান পাদ্রীগণ অপেক্ষা অধিকতর সফলকাম, কেননা তাদের কাছে ইসলামের সত্য ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী রয়েছে।" "যে ব্যক্তিই তাদের (আহমদীদের) আশ্চর্যজনক কার্যাবলী অবলোকন করবে সে বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারবে না যে, কিভাবে এই ক্ষুদ্র (!) জামা'তটি এত বড় মহান জেহাদ করছে, যা কোটি কোটি মুসলমানগণও করতে পারে নি।"

১২. ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর S.G. Willamson তার "Chirist of Muhammad" নামক পুস্তকে লিখেছেন : "ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের (ঘানার) সকল অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দিক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীতরূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং নিশ্চয় এটা খৃষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এটা ঠিক করে বলা যায় না, ক্রুশ অথবা হেলাল আফ্রিকাকে শাসন করবে।"

যেমন গত ১৫শ বছর যাবত মুসলিম বিশ্বে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ও তাঁর জামা'ত সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি পেশ করা হয়েছে সেগুলো পাঠ করলে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষ সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি এই প্রবন্ধের বিভিন্ন লেখক মহোদয়গণের লেখাতে আগত মাহ্‌দী (আ.)ও তাঁর জামা'তের এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত নিদর্শনই প্রমাণিত হয়।

আমরা যদি নবী করীম (সা.)-এর বিরোধীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি তাহলে এমন শত সহস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন রোমান সম্রাট কায়সারের দরবারে রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে আবু সুফিয়ান ১২টি সনদ প্রদান করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে যে, একজন বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্বেও এমন দলিল পেশ করলেন যার ফলশ্রুতিতে কায়সারে রোম হিরোক্লিয়ার্স পরিষ্কার বুঝে নিলেন যে দাবীদার ব্যক্তি এক সত্য খোদা প্রেরিত মহামানব। নবী করীম (সা.) তো আরবের অনেক রাজা বাদশাহদের নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন কেউ কেউ খোদার ভয় হৃদয়ে থাকায় ও কর্মে পবিত্রতা থাকায় সত্য বলে ঘোষণা করলেন, অপরদিকে অন্যরা নোংরা ও যুলুমকারী হওয়ার কারণে পত্রের অবমাননা করলেন।

পাঠকদের কাছে আমরা অতি বিনয়ের সাথে জানাতে চাই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আজীবনের বিরুদ্ধবাদীরা এমন অনেক কলম ধরে ব্যক্ত করেছেন যে, আহমদীয়া জামা'ত, একমাত্র জামা'ত, যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত পরিচয় ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এবং ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষা নিজ জীবনে ও ধন-সম্পদ এবং সকল কিছু দিয়ে সেবা করে যাচ্ছে যার দৃষ্টান্ত আজ অন্য কোন জামা'তে পাওয়া সম্ভব নয়।

১৪. বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ লিখিত গ্রন্থ "বাতায়ন"-এ তিনি উল্লেখ করেন : 'এই যামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব।' 'তাঁর নাম শুনেছি।' 'তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে যারা ইসলামের সেবাব্রতে নেমেছিলেন, আজ তারাই দিকে দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন। মালয়ে তারা মাদাগাস্কারে তারা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপে, আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইসলামের পতাকা তুলে ধরেছেন।' 'হ্যাঁ তাঁরা নিতান্ত মূল্যবান কাজ করেছেন তা শুনেছি।" 'তবে আপনিও এই পথে আসুন। পুথিপত্রে ইসলামের কথা বলার মূল্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ফায়দা ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া জীবনে ইসলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।"

দাবীদার ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ ও উত্তম কর্মের কথা যদি তাঁরই বিরুদ্ধবাদীর মুখে ও কলমে প্রশংসিত হয় তবে বুঝতে হবে দাবীদার ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগত মহাপুরুষ। কারণ, অতীতে নবী রাসূলদের বেলাতেও এরূপভাবে একদিকে বিরোধিতা অপরদিকে প্রশংসা করে প্রমাণ করেছেন। বর্তমান দুনিয়াতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জামা'তের প্রশংসা সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর জামা'তের কেন্দ্র ও বার্ষিক জলসাগুলোতে বিভিন্ন জাতির বড় বড় জ্ঞানি ব্যক্তিগণ ও নেতাগণ স্ব স্ব জাতির পক্ষ থেকে বাণী প্রদান করে তা করছেন, যার নথি আহমদী জামা'তে হাজার হাজার সংরক্ষিত আছে। তারা বলছেন, যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রমাণ, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত আদর্শ, কুরআনের শিক্ষা, ইসলামের বাস্তবায়ন দেখতে হয় তাহলে আহমদীয়া জামা'তকে ছাড়া ভাবা যায় না। জগতের মানুষের বিবেকের দরবারে আমাদের ভালবাসাপূর্ণ আবেদন থাকবে, আপনার বিবেক খুলে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে বুঝবার ও জানবার জন্য এতটুকু চেষ্টার কার্পন্য করবেন না। আমরা আপনাদের জন্য সামান্য লেখার মাধ্যমে এ যুগের মুক্তির পথকে সন্ধান জানাচ্ছি মাত্র। আমাদের আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আহাজারী থাকবে 'হে আল্লাহ্ তুমি তোমার মাহ্‌দী ও মাওউদ (আ.)-কে সত্য বুঝে মানবার জন্য সকল সাহায্য তোমার সৃষ্টি জগতের মানুষের সঙ্গে করে দেখাও, আমীন!

লেখক : **মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ**

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(২য় কিস্তি)

বাল্যকাল থেকে মোবারক আলীর মাঝে ধর্মীয় অনুরাগ ছিল। নামায রোযাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাল মানুষ হিসেবে তাঁর সুপরিচিতি ছিল। সমাজের আলেম উলামাদের মধ্যে ধর্মীয় মতবিরোধ এবং বিভিন্ন ফেরকা প্রত্যক্ষ করে ব্যতিথ হতেন। ইসলামের শিক্ষার সাথে অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদ তুলনামূলক গবেষণা করে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনে প্রচেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

১৯০৫-১৯০৬ সাল এবং এর পরও কয়েক বছর পর্যন্ত আমি নিজে নিজে ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করতাম। ইসলাম ধর্মে (এদেশের মৌলভাদের প্রচারিত ইসলামে) আমার ষোল আনা বিশ্বাস ছিল না। সেইজন্য নামাযের দিকে মনোযোগ ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজে যেতাম, বাইবেলও পড়তাম, হিন্দুদের রামকৃষ্ণ মতবাদও দেখতাম অশ্বিনী কুমার দত্তের ভক্তিযোগ কয়েকবার পড়েছি। রামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও কথামৃত পড়তাম, রামকৃষ্ণের কোন কোন কথা খুব ভাল লাগত, যথা–ভগবানকে এই জীবনে এবং এই পৃথিবীতেই পাওয়া যায়।

বেলুর মাঠে গিয়েছি, রামকৃষ্ণ যেখানে সাধনা করতেন সেই দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দেখতেও গিয়েছি। উকিল উদ্দিন খন্দকার আমার সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি লায়েক জুবিলী স্কুলে কাজ করতেন। ঐ স্কুলের স্থাপয়িতা চৌধুরী মোহাম্মদ লায়েক সাহেব খন্দকার সাহেবকে বেশ স্নেহ করতেন স্কুলের কাজকর্ম সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শও অনেক সময় নিতেন। বেলুর মাঠের সন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ হয়।' প্রায় সকলেই বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট–গেরয়া পরা। গেরুয়াধারী একজন আমেরিকানকেও দেখলাম। তার সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যেই আমি এদেশে এসেছি। আমি বললাম, 'আপনি কি প্রকার সাধনা করেন।' তিনি রামকৃষ্ণের বড় একটা বাঁধানো ছবি দেখিয়ে বললেন, 'এটা পূজা করি এবং এ মূর্তি ধ্যান করি'।

রামকৃষ্ণের কোন কোন কথা ভাল লাগলেও তাঁর অন্য কতগুলি বিষয় আমি পছন্দ করতাম না। রামকৃষ্ণ বলেছেন সব ধর্মই সমান সব ধর্মের ভিতর দিয়ে ভগবানকে লাভ করা যায়'। পৌত্তলিকতা, একত্ববাদ, বহু ইশ্বরবাদ সব কি সমান বলা যায়? রামকৃষ্ণের ভক্তেরা তাঁকে অবতার, জগৎগুরু ইত্যাদি বলেন, কিন্তু তাঁর হিন্দু ধর্মে যে সব গলদ আছে, যথা-জাতিভেদ অস্পৃষ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি। তার স্ত্রী যখন তার সম্মুখে উপস্থিত হন তখন তাঁকে মা মা বলে আহ্বান করেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর বলতে বলতে তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তার ঘুমের সময়ে যদি কেউ তার হাতে টাকা দিত তার হাত নাকি তেরিয়া হয়ে যেত।

ইসলাম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন মনে জাগত। নামায বিশেষ পদ্ধতিতির সঙ্গে আরবিতে পড়া, সুদ, বহু বিবাহ, অবরোধ ও পর্দা, চোরের হাত কেটে দেয়া, সঙ্গীত বর্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাল ভাল আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করেও কোন সন্তুষজনক উত্তর পাইনি। মুসলিমদের ধর্মাচরণের মধ্যে সারশূন্য একটা খোলাস দেখতাম।

ব্রাহ্মধর্ম অনেকটা ভাল লাগত। কিন্তু তার মধ্যেও যুক্তিই একমাত্র প্রধান অবলম্বন। ৫০/৬০ বছরেই ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ যেন তাঁর জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। সমাজের বিধানগুলি সর্বাঙ্গীন নয়। বিবাহ উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের কোন নিজস্ব বিধান নেই। অল্প সংখ্যক ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষিত লোক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে এটা মোটেই প্রবেশ করেনি। খৃষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদে অন্ধবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ঐ সময় আমেরিকার গভীর চিন্তাশীল লেখক ইমারশনের লেখাও পড়তাম। ইমারশনের লেখা আমার খুব ভাল লাগত। তার Oversoad spiritual laws, Compansation, Representative man ইত্যাদি বার বার পড়ে শান্তি লাভ করেছি এবং উপকৃত হয়েছি। তাঁর চিন্তাধারা স্বাভাবিক এবং গভীর ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট, ১৯৬৫)।

এ টানাপোড়নের মাঝে সত্যকে জানার অদম্য আগ্রহী মানুষ কোলকাতা মাদ্রাসা স্কুলে শিক্ষকতাকালে মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। তখন আল্লাহ্ তাআলার অমোঘ বিধানে মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে এক বন্ধু ১৯০৭ সালে আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশিত ইংরেজি Review of Religions পত্রিকার একটি কপি তাঁকে প্রদান করেন। ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ এ পত্রিকাটি পাঠে তিনি বিস্মিত হন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কাদিয়ানীর নামাযের ব্যাখ্যায় রচিত একটি লেখা পড়ে ব্যতিক্রমধর্মী স্বাদ পান। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণায় তাঁর মনে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসনে ইতিবাচক প্রভাব পরে। তাঁর ভাষায়–

"নামাযকে এদেশের মৌলভী সাহেবরা আল্লাহ্ তাআলার একটি ট্যাক্স বলে ব্যাখ্যা করেন। নামাযের ট্যাক্স না দিলে দোযখের

শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্য নামায অবশ্যই পড়তে হবে। নামাযের কিছু বুঝুক বা না বুঝুক এই ট্যাক্স দিতে হবে। নচেৎ এক ওয়াক্ত নামায কাযা হলে ৮০ হক্কা দোযখ ভোগ করতে হবে। Review of Religions এ প্রকাশিত নামায সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে এটাই আলোচনা হয়েছিল যে, নামায আল্লাহ্ তাআলার ট্যাক্স নয়। বান্দায় নামায না পড়লে আল্লাহ্ তাআলার কিছু আসে যায় না। নামায মানুষের নিজের জন্যই আবশ্যকীয়। এটা রূহ বা আত্মার খোরাক। বাহ্যিক খাদ্য যেমন শরীরের পুষ্টির জন্য দরকার, আধ্যাত্মিক খোরাকও তেমনি আত্মার উন্নতির জন্য দরকার। প্রবন্ধটির যুক্তিগুলি এত স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ যে, হৃদয় সহজে গ্রহণ করে"। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ আগষ্ট, ১৯৬৫)।

অত:পর কোলকাতা মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে কাদিয়ান থেকে প্রেরিত Review of Religions পত্রিকা তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন করতে থাকেন। আলীঘর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব না হলেও আহমদীয়াতের সত্যতার উপর গবেষণায় ঐশী নিয়ামত আহরণে উদ্বুদ্ধ হন। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক মতাদর্শের অসারতা এবং কান্ডারীহীন ইসলামের দূরাবস্থা, উপরন্তু নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম সমাজের বাস্তব অবস্থার মাঝে আহমদীয়াতের সত্যতা তাঁর হৃদয়পটে দানা বাঁধে। তিনি আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত লাভে সিরাতাল মোস্তাকিমের পথিক হওয়ার যোগ্য হন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন–'আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টাসাধনা করে নিশ্চয় আমরা আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন' (সূরা আল আন্ কাবুত : ৭০)।

বলাবাহুল্য, সে সময় পুণ্যবান মানুষ মোবারক আলী সাহেব ক'টি সত্য স্বপ্নও কাশফ দেখে ছিলেন। এগুলি আল্লাহ্ তাআলা মোযেজা হিসেবে পরিস্ফুটিত হয়। নিম্নে এর তিনটি বর্ণনা করা হলো :-

(১) তিনি ১৯০৭ সালে একবার স্বপ্ন দেখেন– সমস্ত ভারতবর্ষ যেন তাঁর চোখের সামনে। ভারতের উত্তর পশ্চিমের এক স্থানে আকাশ থেকে আলো নীচের দিকে নেমে আসতেছে। সেই আলো মাটিতে পৌঁছা মাত্রই ক্রমশ; বিস্তৃত হতে থাকে এবং এর দ্বারা সমস্ত পাঞ্জাব ভূমি আলোকিত হয়ে পরে এবং সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা তরঙ্গায়িত হয়ে চতুর্দিকে দূরদূরান্তে ছড়ায়ে পড়তে থাকে। এই আলোক তরঙ্গমালা হতে একটি তরঙ্গ বাংলার মাটিতেও এসে পৌঁছে। এটা বিশেষভাবে বাংলার পূর্ব উত্তর দিকেই অধিক উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। বোধ হয় এ আলোতে সারা দুনিয়া আলোকিত হতে থাকে।

(২) একবার স্বপ্নে দেখেন– এক বন্ধুর সাথে পদব্রজে ভারতের উত্তর পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশ পাড় হয়ে আরো পশ্চিমে অগ্রসর হন। সমস্ত রাস্তার দুই ধারে স্তপীকৃত মানুষের হাড়। এর মধ্য দিয়ে রাস্তা। পাঞ্জাবের নিকট গিয়ে একটি নদী পাড় হতে হয়। কিন্তু বাধা পড়ে। অবশেষে বাধা দূর হয়। পঞ্জাবে পৌঁছেন। তাঁর সাথে যে বন্ধু ছিলেন তিনি গৌরবর্ণ এবং তাঁর মতই প্রায় হালকা পাতলা দেহ গড়নের মানুষ।

(৩) ১৯০৮ সালে দীর্ঘদিন তাঁর পেটের পীড়া ছিল। অনেক চিকিৎসার পরও আরোগ্য হয়নি। তখন ভাবলেন কোন রূহানী চিকিৎসায় হয়তো আরোগ্য সম্ভব। তাঁর এ অবস্থা তিনি পিতাকে জানান। তখন পিতা তাঁকে একটি অজিফা শিক্ষা দেন। তাহলো–'কিছুদিন প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস অন্তত বিশ বার করে পাঠ করে কিছুক্ষণ চোখ বোজে নামাযের বিছানার উপর বসে ধ্যানেমগ্ন থাকবে'। পিতার উপদেশানুসারে তিনি তা পালন করতে থাকেন। চোখ বোজে বসে থাকার দুই/তিন দিন পরই দেখেন পাগড়ী মাথায় এক বুযুর্গ বৃদ্ধ ব্যক্তি এক কামড়ায় বসে আছেন। তাঁর পাশে অনেক লোক বসা। মনে হলো তিনি একজন ধর্মগুরু এবং তাঁর পার্শ্বের সবাই তাঁর শিষ্য। তাঁদের মধ্যে কারো চেহারা বেশ সুন্দর ও রং ফর্সা। সেই বুযুর্গ প্রথমে দূরে ছিল। যতই দিন যায় তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকে। ক্রমে নিকটবর্তী হতে হতে যেন তাঁর শরীরের সাথে মিশে এক হয়ে যান। বেশ ক'দিন এইরূপ দেখেন। এক সপ্তাহ পর পিতা জিজ্ঞাসা করেন কিছু দেখতে পেয়েছো কি? উত্তরে তিনি তা বর্ণনা করেন। তখন পিতা বলেন ঐ চেহারার কোনও বুযুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে তাঁর শীষ্যত্ব গ্রহন করিও। অত:পর সেই বুযুর্গ ব্যক্তির সন্ধান লাভে তাঁর মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলায় তাঁর পূর্বে চারজন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা যথার্থ উপলব্ধি করে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সৌভাগ্যবানরা হলেন (১) চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলী গ্রামের হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ স(রা.) তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে ১৯০৫ সালে কাদিয়ানে বয়আত করেন। (২) কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার নাগেরগাঁও গ্রামের হযরত রইস উদ্দীন খাঁ (রা.) তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে কাদিয়ানে ১৯০৬ সালে বয়আত করেন। (৩) হযরত রইসউদ্দিন খাঁ (রা.)-এর স্ত্রী সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট ১৯০৭ সালে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেন এবং (৪) আব্দুল খালেক সাহেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভরতপুর মুর্শিদাবাদ। তিনি ১৯০৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে কাদিয়ানে বয়আত করেন। কিন্তু মোবারক আলী সাহেবের বয়আত করার পূর্বে উক্ত পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে কোন পরিচয় হয়নি।

১৯০৪ সালে তিনি কোলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে আসামের ডিগ্রঘরের মোহাম্মদ আতাউর রহমান নামে এক ছাত্র তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। তাঁর সাথে পরিচয়ের পর দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণকারী আহমদী। তাই তাঁর নিকট থেকে আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি আরও বিস্তারিত অবগত হন। সঠিক ধারণা লাভ করেন। তখন ভারতের রাজধানী কোলকাতায় সেক্রেটারীয়েটে উচ্চপদস্থ ক'জন সরকারি কর্মকর্তাও আহমদী ছিলেন। আতাউর রহমানের মাধ্যমে মোবারক আলীর তাঁদের সাথে পরিচয় হয়। তাঁরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার উপর মোবারক আলীকে তবলীগ করেন। একবার তাদের সাথে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোলকাতা ইডেন গার্ডেনে আহমদীদের সাথে তিনি ঈদের নামায আদায় করেন। (চলবে)

স্মৃতির পাতা থেকে-

জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A

(৪র্থ কিস্তি)

কাদিয়ানের জলসায় অংশগ্রহণ, পরবর্তীতে আমাদের পরিবারে অনেক বরকত নিয়ে আসে। এখন অনেক বছর পর অনেক ঘটনা স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। তবুও যখন পেছনে তাকাই তখন অনুভব করতে পারি ১৯৭৯ সন আল্লাহ্ তাআলার অজস্র করুণা ধারায় ভরপুরের বছর ছিল। শুধু এই অধম খাকছারের জন্য নয় কেন আহমদীয়াত গোমরাহ্ মুসলিমের জন্যও বটে। এই ১৯৭৯ সনেই মোহতরম মওলানা করম ইলাহী জাফর সাহেব স্পেন দেশের করডোভার আলহামরা মসজিদে, ১৪৯২ খৃষ্ট সনে, খৃষ্টান ক্রুসেডারগণ কর্তৃক আরব মুসলমানের নিতান্ত অমানুষিক কায়দায় অপমানজনক বিতারণের ৫০০ বছর পর, ১৯৪২ সনে তাঁর উপর অর্পিত মিশন দায়িত্ব পূর্ণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই বৎসরই পাকিস্তানী বাসী প্রফেসর ড: আব্দুস সালাম সাহেব পদার্থ বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পেয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমানের এই সম্মান অর্জনের মর্যাদা লাভ করেন এবং এই নগণ্য খাদেমকে মুসলিম জাহানের এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের সাথে মুসলিম জাহানের আর এক নক্ষত্র আন্তর্জাতিক আদালতের চিফ জাষ্টিস চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের সাথে, রাবওয়ায় ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় অংশগ্রহণকালীন সময়ে ষ্টেজের উপর মুলাকাতের সৌভাগ্য আল্লাহ্ তাআলা দান করেছিলেন; আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯৮০ সনের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরে আসি। এদিকে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় জলসা সালানা শেষে পাকিস্তান থেকে আগত মোহতরম মওলানা আবদুল মালেক খান সাহেবের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট সম্মানিত মেহমানদের টিম মোহতরম চৌধুরী সাব্বির আহমদ সাহেব, মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালি সাহেব, মওলানা মোহাম্মাদ দীন নাজ সাহেব চট্টগ্রাম সফরে আসেন এবং সম্মানিত মেহমানদেরকে একটি সকাল নাস্তার দাওয়াতে আমার ঘরে আপ্যায়ন করার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়। নাস্তাপর্ব চলাকালীন সময়ে কথাবার্তার মাধ্যে আমি সমবেত সকলকে দোয়ার আবেদন জানালাম, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বড় ভাই আমজাদ হোসেন সাহেবের জন্য যাকে প্রায় বছর সময় বেশী ধরে আমি তবলীগ করতেছিলাম। যদিও আহমদীয়াত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের চট্টগ্রাম মসজিদে তিনি রীতিমত জুমুআ নামাযে এবং আমাদের অন্যান্য মজলিসে শরীক হচ্ছিলেন।

কিন্তু বয়আত নিতে বললে, "আচ্ছা আমি দেখি" বলে কালক্ষেপ করছিলেন। ঐ দিন সকালে পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রমে ব্যস্ততা হেতু তিনি আমাদের নাস্তার নিমন্ত্রণে শরীক হতে পারেন নি'। আহমদীয়াত সম্বন্ধে উনার স্বচ্ছতার প্রমাণ বর্ণনা আমি উনারই নিজ কথিত আহমদীয়াতকে ঘিরে একটি ছোট ঘটনার কাহিনী সম্মানিত মেহমানদের সামনে বর্ণনা করলাম। উনার নিজ বর্ণনা মতে: "এই কিছু দিন আগে একদিন লাঞ্চের সময় ছিল মিন কেনটিনে খাবার টেবিলে আমার ২/৪ জন সহকর্মী অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করল : আমি কেন কাদিয়ানী হতে গেলাম? উত্তরে আমি বললাম, আমি এখনও কাদিয়ানী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি মাত্র।

তাদের বই পত্র পড়ছি, তাদের চলাফেরা দেখছি। তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমগুলি দেখেছি। তাদের সম্মেলনগুলোতে অংশ নিয়েছি আমি, কোন ব্যতিক্রম বা অসামঞ্জস্য কোন ব্যাপারে দেখিনি। তবে একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে যাদের মা-বাপ জীবনে কোন না কোন ভাল কাজ করেনি, তাদের সন্তান কাদিয়ানী হতে পারবে না।"

ঐ দিন বিকেলে প্রেসিডেন্ট জনাব ফালুমিয়া সাহেবের ঘরে সফরকারী মেহমানদের সম্মানে ডিনারের দাওয়াতে আমি, আমজাদ সাহেব ও মির্যা মোহাম্মদ আলী আমজাদ ভাই সাহেবকে মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ফালুমিয়া সাহেবও উপস্থিত সবার সামনে আমজাদ ভাই সম্বন্ধে ও তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সুউচ্চ প্রশংসিত মন্তব্য করলেন।

আমজাদ ভাই এর সাথে কথা বলতে বলতে মওলানা সাহেব একটি বয়আত ফরম, একটি সাদা কাগজ ও একটি কলম আনালেন। জিজ্ঞাসা করলেন সমস্ত কিছু জেনে শুনেও কেন তিনি বয়আত নেন না। আমজাদ সাহেব "পরে চিন্তা করে দেখব" এই কথা বলতে মওলানা সাহেব বয়আত ফরম, সাদা কাগজ ও কলমটি আমজাদ সাহেবের হাতে দিয়ে গম্ভীর গলায় অনুরোধ সুরে বললেন, "ভাই তাহলে দয়া করে আপনি সাদা কাগজটিতে লিখুন যে আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে এমন কোন ওয়াদা করেছেন যে তিনি আগামী কাল পর্যন্ত আপনাকে জীবন বাঁচিয়ে রাখবেন।

আর যদি না লিখতে পারেন তাহলে অনুগ্রহ করে বয়আত ফরমটা এখুনিই দস্তখত করে দিন।" আমি আমজাদ ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর লক্ষ্য করলাম, মওলানা সাহেবের সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি চুপসিয়ে গেছেন। এদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু ভাবলেন। তারপর 'বিসমিল্লাহ্' বলে তিনি বয়আত ফরমে সই করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্। সেটা আমার কাদিয়ান জলসা সফরের সফল। ১৯৭৯ সনের বৃহত্তম বিজয় পুরস্কার।

আমার অনেক দিনের পরিশ্রমের সাফল্য।

উপস্থিত সবাই মওলানা সাহেবের পরিচালনায় উনার জন্য দোয়া করলেন এবং সেই বছরের জলসা সালানায় রাবওয়া যাওয়ার জন্য আমজাদ সাহেব ও মির্যা সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন। জলসা সালানাকে উপলক্ষ্য করে আমি এই কাহিনীগুলি এ জন্যই লিখলাম সে পুরা কাহিনীর ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে সিটপ্রাপ্তি মোতাবেক স্থির হয়ে গেল যে আমরা ২২ ফেব্রুয়ারী সকালে লন্ডন হয়ে ডেনমার্কের পথে ঢাকা ত্যাগ করব কিন্তু ভিশা নেওয়া পরবর্তিতে ফ্লাইটের টিকেট নেওয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রত্যেক সদস্যের সশরীরে থাকার প্রয়োজন হেতু আমরা ১৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা চলে আসি।

মন্ত্রণালয়ে আমাদের টিম লিডার জয়েন্ট সেক্রেটারী নুরুল আমিন খান সাহেব ট্রাভেল এজেন্ট এর লোককে ডেকে আমাদের ভিসা ও টিকেট ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, এজেন্ট আমাদেরকে ইংল্যান্ডসহ ৭টি ইউরোপীয় দেশ এর ভিসা করিয়ে দিলেন এবং আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে সাউদী আরবের ভিসা নিতে আমাকে সাহায্য করলেন। বিদেশ সফর সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ কর্ম শেষ করার পর ফ্লাইট টিকেট নেওয়ার জন্য ট্রাভেল এজেন্ট এর অফিসে যাই মতিঝিল এলাকায়, ট্রাভেলের লোক টিকেট লিখছিল। আমি টেবিলের অপর পার্শ্বে উনার বিপরীত মুখামুখী বসে টিকেট পড়ছিলাম স্থিরকৃত পথ : ঢাকা-লন্ডন কোপেন হেগেন নিউকোবিং এন্ড বেক। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কি যেন উদায় হল কে যেন পেছন থেকে আমাকে বলছিল "এটাই তো সময় এখনি ঠিক করে বদলিয়ে নাও।"

তৎক্ষণাৎ আমি এজেন্টকে অনুরোধ করলাম "ইউরোপ সফর শেষে ফিরতি ফ্লাইট লন্ডন-জেদ্দা-ঢাকা দেওয়া যেতে পারে কিনা। অবশ্যই দেওয়া যাবে কিন্তু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর 'জেদ্দা-ঢাকা' কোন ফ্লাইট নাই। তবে যেহেতু আপনি Standard fare এ ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের পাসেনজার, সেহেতু যে কোন রুট যে কোন এয়ার লাইনের ফ্লাইট বেছে নিতে পারেন।" আমি বললাম" তাহলে জেদ্দা-ঢাকা" ফ্লাইট বিমান বাংলাদেশ এ পরিবর্তন করতে পারেন।"

উনি বলেন, অবশ্যই করব, তবে যেহেতু ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর টিকেট ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইটে জেদ্দা যাচ্ছেন এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ আপনাকে আপনার অনুরোধে ডিসচার্জ করে দিচ্ছে সেহেতু জেদ্দাতে থাকার জন্য আপনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ থেকে কোন হোটেল একোমেডেশন দাবী করতে পারবেন না বলে একটা একটা ইনডেমিনিটি সই করে দেবেন।" আমি সই দিলাম ও টিকেট পেয়ে গেলাম।

নামের আগে হাজী লেখা বা আলহাজ্জ লেখার জন্য হজ্জ করার সখ আমার কোন কালে না থাকলেও এখনও নাই এবং এখনও লিখি না, যদিও ১৯৮৪ সনে আমি পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদন করেছি। পবিত্র খানায়ে কাবা ও মদীনা শরীফ দেখার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। ও রকম টাকা পয়সা ছিলনা যে পকেটের পয়সা খরচ করে মক্কা মদীনা সফর করি। হাজী হওয়ার চাইতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখিয়ে মানুষ করা ছিল আমার চোখে ফরজ।

তবে মনে মনে এই আশাও পোষণ করতাম সাউদি আরবে কোন আরবী দেশে চাকুরী নিতে পারলে অর্থাভাবও ঘুচবে আর বিনা পয়সায় বা অল্প খরচে মক্কা মদীনা সফরও হবে এমনকি ঠিকমত সময়ে সঠিক মওকায় পড়লে হজ্জ করাও হয়ে যাবে। এই সূত্রে অনেক চেষ্টা তদবীর করেও ফল হয়নি।

(চলবে)

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: "আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'ঈদ শুধু উৎসব নয় বরং ইবাদত'**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ধর্মীয় উৎসব ও ইবাদতের নামই ঈদ

ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে 'ঈদ'। বছরে আমরা দু'টি ঈদ উদযাপন করি। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। আর কিছু দিন পর আমরা 'ঈদুল ফিতর' উদযাপন করতে যাচ্ছি। 'ঈদ' মানে আনন্দ আর 'ফিতর' মানে ভঙ্গ করা বা বিরতি করা। ঈদুল ফিতর মানে রোযা ভঙ্গের আনন্দ। আল্লাহ্‌র 'সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর আদেশে সমস্ত বৈধ বিষয় থেকে একমাস বিরত থাকার পর তাঁরই আদেশ অনুযায়ী সেগুলো চালু করার নামই ঈদুল ফিতর। রমযান শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। ঈদুল ফিতরের দিন দু'টি কাজ করা ওয়াজীব। একটি হলো ফিতরা আদায় করা এবং অন্যটি ঈদের সালাত আদায় করা।

এক মাস রোযা রাখার পর ঈদ উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; যেন আমরা বুঝতে পারি, আসল খুশি ও আনন্দ কখন লাভ হয়? গরীবদের ক্ষুধার জ্বালা আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন আমরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকি। আমাদের ঈদ তখনই ঈদ (প্রকৃত) হবে, যখন আমরা একজন অন্যজনের দুঃখ কষ্টকে অনুভব করতে পারবো, একে অন্যের প্রতি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার তথা সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবো। আর মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করাটাও একটা ইবাদত। এভাবে ঈদ আমাদের আনন্দ দানের পাশাপাশি আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত করারও সুযোগ করে দেয়। তাই দু:খী মানুষের দুঃখ মোচন, গরীবদের সাহায্য করা, ফিৎরানা, ফিদিয়া ও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে স্রষ্টার সেবা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কুরআন করীমে সূরা দাহর এর ৯নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, "তারা মিসকীন ও বন্দীদের এ জন্য খাওয়ায় যেন তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করে। তাঁর আদেশের অনুসরণ করে আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হত পারে।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো অভাব পূরণ করবে, তাতে তার উদ্দেশ্য হলো সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্টি করবে। প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে অসন্তুষ্ট করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই অসন্তুষ্ট করলা। আর যে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করলো, আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।" (বায়হাকী সোয়াবুল ঈমান) তাই আমাদেরকে দান খয়রাতের দিকেও বেশি বেশি দৃষ্টি দিতে হবে।

রমযান মাসে আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন। তাই এই মাসটি অতি পবিত্র। এই পবিত্র মাসে সকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি আমাদের গভীর ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ পায়। সংযম, ত্যাগ, দান, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়াসহ অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে তবেই আমাদের ঈদ হবে প্রকৃত ঈদ।

ইসমত আরা উর্মি, (চট্টগ্রাম)

প্রকৃত ঈদ তাদেরই যারা আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা

সারা বছরে পানাহারের পর একটি মাস আসে পানাহার বর্জনের সময় যার নাম রোযা। রোযা রাখা হয় আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য এর ফল স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাই বান্দাদের দিয়ে থাকেন। প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তাআলা পুরস্কারে ভূষিত করেন। রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট কস্তুরীর গন্ধের চেয়েও প্রিয়। রোযা থেকে আমরা আত্মসংযমী, ধৈর্য, দানশীলতা, আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাল কাজের প্রেরণা পাই। আর বিভিন্ন মন্দ কাজ যেমন মিথ্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি অপকর্ম থেকে আমরা দূরে থাকি। এভাবে এ মাসের শিক্ষাকে সারা বছর স্থায়ীভাবে জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারাটাই স্বার্থকতা। এটিই প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তিরা করে থাকেন। প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তি অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় যতটা না খরচ করে রোযার সময় চেষ্টা করে তার চেয়ে আরো বেশি যেন খরচ করতে পারে।

এক মাস রোযার পর আসে ঈদ। ঈদের আনন্দ সবাই সবার সাথে ভাগ করে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈদ কি শুধু উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না ইবাদতও? যে ঈমানদার ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সারা বছর মহান আল্লাহ্‌ তাআলার শোকর গুযার করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর ইবাদত করে এবং যখন রোযা আসে এবং সে রোযা রাখে আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য আর সাধ্যমত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তার ঈদ শুধু আনন্দই দেবে না বরং ইবাদতে রূপান্তরিত হবে।

যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও রমযান মাসে রোযা রাখে না সে কি করে ভাল গুণের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি রমযান রোযা রাখে না এবং আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত ঠিকভাবে করে না সে সারা বছরে অন্যান্য সময়ও আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত করে না। রোযা রাখার পর, আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত বন্দেগীর পর একদিন আসে ঈদুল ফিতর এই ঈদে গরীব ধনী সবাই এক হয়ে ঈদ উদযাপন করে আনন্দের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা ঈদকে আনন্দ উৎসব ভেবেই সারা রোযার মাস আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত না করে শুধু ব্যস্ত থাকে কেনাকাটা নিয়ে। তাদের ঈদ কি প্রকৃত ঈদ? এ ঈদ তাদের জন্য কি কোন কল্যাণ নিয়ে আসবে? তারা হৈ হুল্লোর, দামী জামা-কাপড় নিয়েই ঈদে ব্যস্ত থাকে, ইবাদত করার চিন্তাও তাদের মনে আসে না।

মু'মিন রোযাদার ব্যক্তি সারা বছর এই একটা মাসের অপেক্ষা করে আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদতে কাটানোর জন্য। আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সে রোযা রাখে আর আল্লাহ্‌ তাআলাই রোযার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। মু'মিন বান্দা শুধু রমযান মাসেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না সে সারা বছরের প্রতিটি দিনই আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটায়। এমনকি রমযানের পর যে খুশির ঈদ আসে তাতেও মু'মিন বান্দা ইবাদত

করতে বা খোদাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় না। এমনকি ঈদকে সে হাসি তামাশায়, আনন্দে ভরপুর না করে ইবাদত বন্দেগীতে কাটানোর চেষ্টা করে। যদিও ঈদ আনন্দেরই দিন। তবে মু'মিন ব্যক্তির ঈদই প্রকৃত আনন্দের ঈদ। যে আনন্দে মহান আল্লাহ্ তাআলার শোকর গুজার হয় না তা কেমন আনন্দ? নিছক শুধু আনন্দ কোন কাজে আসবে কি?

মহান আল্লাহ্ তাআলা করুন আমরা সবাই যেন তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে রমযান মাস শেষ করে ঈদের খুশিকে বরণ করতে পারি।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

ঈদ আনন্দ ঈদ ইবাদত

সারা মুসলিম জাহানে সিয়াম সাধনা এবং ত্যাগের মহিমার মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয় পবিত্র ঈদ। কিন্তু কিছু বিকৃত মন মানুষিকতা সম্পন্ন লোকেরা ঈদকে ধর্ম ও কৃষ্টির আলোকে শুধু আনন্দ উৎসবের পর্ব মনে করে এবং অনেকে নববর্ষ বা বড় দিনের উৎসবের ন্যায় ঈদকে উদযাপন করে। তারা প্রতি বছর ঈদের উৎসবের দ্বারা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে ঈদকে সাজায়। প্রত্যেকেই ঈদকে সামনে রেখে সামর্থ অনুযায়ী নতুন নতুন পোশাকে সজ্জিত হয় আর উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থায় মহা ব্যস্ত থাকে।

আর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোতে ঈদকে সামনে রেখে বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতি দিয়ে ঈদের উৎসব পালিত করে। বর্তমান ঈদের যেসব অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পালন করে তাতে কোন আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই। আসলে ইসলামকে সঠিকভাবে না জানার কারণেই এই ধরনের অপসংস্কৃতিতে লোকেরা জড়িয়ে আছে।

আমরা ঈদের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। প্রকৃতপক্ষে ঈদ নিছক কোন আনুষ্ঠানিকতার নাম নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া একটি দিন যা মু'মিন মোত্তাকীদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের বিশেষ মুহূর্ত। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, প্রকৃত ঈদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যথাযথ ভাবে কুরআন হাদীসের আলোকে নিজের জীবন পরিচালিত করা। তাহলেই এ ঈদ পালন হবে সার্থক।

আমাতুন নূর চৌধুরী (মুন্নি), জামালপুর, হবিগঞ্জ।

ঈদ শুধু উৎসব নয় বরং ইবাদত

ঈদ মানে হল আনন্দ। ঈদ শব্দটির মূল অর্থ খুশী। মহান আল্লাহ্ তাআলা মুসলমান জাতির জন্য প্রতি বছর দু'টি ঈদ নির্ধারণ করেছেন। মুসলমানদের জন্য উভয় ঈদই মহাগুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত এটাতে আনন্দের উপলক্ষ্য বলেই জানি। কিন্তু আসলে ঈদ হল একটি ইবাদত। একমাস সিয়াম সাধনার পর মু'মিন ব্যক্তিরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে থাকেন মূলত ঈদের দিনেই। রোযাদাররা ঈদের দিন মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি এবং তুমি আমাদেরকে রোযা রাখার তৌফিক দান করেছ। যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে খুশি করার জন্য রোযা রাখে তাদের জন্য মূলত ঈদ একটি ইবাদত ও আনন্দের উপলক্ষ্য। ঈদের দিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দুই রাকাত ওয়াজীব নামাযের মাধ্যমে ঈদের পূর্ণ ইবাদত ও আনন্দের সূচনা করেন। ঈদের দিন সবার সাথে আলিঙ্গন করা, আনন্দ ভাগাভাগি করা, গরীব মিসকিনদের খাওয়ানো ইত্যাদি মূল ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে, আনন্দকে উপলক্ষ্য করে কিছু মানুষ নানা ধরনের দুনিয়াবী কুসংস্কারে লিপ্ত হয়। যা আমাদের মুসলমান জাতির কোন ক্রমেই কাম্য নয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, ঈদকে শুধু আনন্দ বা খুশি মনে না করে বরং এটাকে ইবাদতের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা। তাহলেই ঈদের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হবে। আমাদের সবার প্রধান কাজ হল ঈদের দিনটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের দিন হিসেবে অতিবাহিত করা, আমীন।

এস, এম, সানাউল্লাহ, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'মানব সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত'।**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

লন্ডস্থ জামেয়া হতে আগত প্রবাসী বাংলাদেশী চার জন ছাত্রের পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম

(ছবির ডান দিক থেকে) ইবরাহীম আহমদ, মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, আব্দুল কুদ্দুস, সর্ববামে মোহাম্মদ জাকারিয়া (আতায়ে রাব্বি হাদী অনুপস্থিত)

হুযূর আকদাস (আই.)-এর নির্দেশনায় বাংলাদেশী প্রবাসী চার জন ছাত্র যারা লন্ডস্থ জামেয়াতে অধ্যয়নরত, তারা গত ১০ আগষ্ট/২০১১ তারিখ বাংলাদেশ জামেয়ার পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের কতিপয় জামা'ত পরিদর্শনে ওয়াকফে আরযীতে আসেন। নিম্নে তাদের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত কর্মকান্ড উপস্থাপিত হলো :

১। আতায়ে রাব্বি হাদী
পিতা : মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল হাদী
জন্মস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ওয়াকফে আরযীতে অবস্থানকৃত জামা'তের নাম : নাসিরাবাদ
সময়কাল : ১১-১৬ আগষ্ট/২০১১ ইং
তিনি চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

২। ইবরাহীম আহমদ
পিতা : মোহতরম কাউসার আহমদ
জন্মস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া (বাসুদেব)
ওয়াকফে আরযীতে অবস্থানকৃত জামা'তের নাম : তারুয়া
সময়কাল : ঐ। তিনি ৩য় বর্ষের ছাত্র

৩। আব্দুল কুদ্দুস
পিতা : মোহতরম জাররার আরেফ
দাদী : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
দাদা : কলিকাতাবাসী
ওয়াকফে আরযীতে অবস্থানকৃত জামা'তের নাম : আহমদনগর
সময়কাল : ঐ। তিনি ৬ষ্ঠ বর্ষের ছাত্র।

৪। শেখ জাকারিয়া
পিতা : মোহতরম শেখ মাগফুরুর রহমান
জন্মস্থান : সুন্দরবন
ওয়াকফে আরযীতে অবস্থানকৃত জামা'ত : তেবাড়ীয়া
সময় কাল : ঐ। তিনি ২য় বর্ষের ছাত্র।

সম্পাদিত কার্যাদি : তারা গত ১০ আগষ্ট লন্ডস্থ জামেয়া থেকে বাংলাদেশে ওয়াকফে আরযী প্রোগ্রামে আসেন। আগামী ২৪ আগষ্ট যথারীতি লন্ডন চলে যাবেন। তাদের প্রত্যেকের জন্মস্থানই বাংলাদেশে। তাই হুযূর (আই.) তাদেরকে বাংলাদেশের পরিবেশ, বাংলা ভাষা চর্চা ও বাংলাদেশের জামেয়া সম্পর্কে ধারণা নিতে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে তাদের ৪ জনই বাংলাদেশের ৪টি জামা'তে ৬ দিন করে অবস্থান করে আসছেন। যেহেতু তারা ছোট বয়সেই বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন তাই বাংলা ভাষার উপর তাদের তেমন দখল নেই। গত ১৯/০৮/২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তাদের বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

বক্তব্যে তাদের প্রত্যেকেই বার বার যে কথাটি বলেছেন : তা হলো হুযূর (আই.)-এর এত দূরে অবস্থান করেও হুযূর (আই.)-এর প্রতি আপনাদের গভীর প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, দেখে আমরা সত্যিই মুগ্ধ।

আমরা আপনাদের বন্ধুসুলভ আচরণ ও আথিতেয়তায় আপ্লুত হয়েছি। আপনাদের ভালবাসায় আমরা অভিভুত। আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা জামা'তের উত্তম ফলাফল করে জামা'তের অধিকতর সেবায় নিবেদিত হতে পারি।

তারা জামা'তগুলির হালকা হালকা ঘুরে আহমদী ভ্রাতাদের সুখ দুঃখের খবর নিয়েছেন। ভালবাসা বিনিময় করেছেন।

এ কয়েকদিনে তারা আরো কয়েকটি জামা'ত পরিদর্শন পূর্বক জামা'তে সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করবেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবেন। তারা বাংলাদেশে জামেয়ার ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে আলোচনা করবেন।

অত:পর লন্ডনের উদ্দেশ্যে ২৪/০৮/১১ তারিখ ঢাকা ত্যাগ করবেন। বাংলাদেশ জামা'তের নিষ্ঠাবান কর্মীগণের এই ৪ সন্তান যেন জামেয়ায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করে বাংলাদেশের আহমদীয়াতে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তার জন্য আমরা সবাই দোয়া জারি রাখবো।

হে আল্লাহ্! তুমি তাদের চেষ্টায় বেশি বেশি বরকত দান কর, তাদেরকে ঐশীজ্ঞানে পরিপূর্ণ কর।

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী

সংবাদ

বগুড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭/০৭/২০১১ বগুড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ গোলবার হোসেন। জলসার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, বগুড়া।

তারপর হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সীরাতের উপর বক্তৃতা করেন মৌ. আবু তাহের, মোয়াল্লেম, ময়মনসিংহ। তারপর আলোচনা করেন জনাব আব্দুস সালাম। উক্ত জলসায় পুরুষ মহিলাসহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। জলসা শেষে প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

আহমদনগর লাজনা ইমাইল্লাহর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৩/০৭/২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ববিতা পুতুল। আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর।

হাদীস পাঠ করেন সামিয়া রহমান। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন সেলিনা খোকা। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর বিনয়ী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন কুররাতুল আইন। সবশেষে মিরাজ ও ইশারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিলকিস তাহের, তিনি সবাইকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করার আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ৫৮ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহর ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩ জুলাই, ২০১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনায়, খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহর ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি ও রিজিওনাল নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুল গফুর এর সভাপতিত্বে ২২ জুলাই, ২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান খুলনা জামা'তের আমীর ও জেলা নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এবং মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা মোহাম্মদ খুরশেদ আলম ও মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলম খান উপস্থিত থেকে ইজতেমার গুরুত্ব এবং আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান। ইজতেমায় তেলওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত-লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামে রেসানী, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৩ জুলাই, ২০১১ তারিখ বাজামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। অত:পর সকাল ৮-৩০ মিনিট হতে ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে বেলা ১২-০০ ঘটিকায় জনাব আব্দুল গফুর, রিজিওনাল নাযেম ও মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ এর মোহতরম সদর এর সম্মানিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা নাযেম এবং আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানের সভাপিত আনসারুল্লাহ্ সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহদের দিক নির্দেশনা উল্লেখ পূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইজতেমায় খুলনা সাতক্ষীরা জেলার ৬টি মজলিসের মধ্যে ৩টি মজলিস হতে ৩২ জন আনসারসহ প্রায় ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুলাই রোজ সোমবার দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৩তম স্থানীয় ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সাদেকা হক, নায়েব সদর-২ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খালেদা নাজমুল। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ছিলেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন আমাতুল হাফিজ। আহাদনামা পাঠ করান শামিমা আক্তার লিলি, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তারপর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামা'তের আমীর। নযম পাঠ করেন নাসিরা আক্তার। তারপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট।

বিকাল ৩.৩০ মিনিটে সমাপনী অধিবেশন কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সাদেকা হক এবং খালেদা নাজমুল। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ২৩তম ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। এতে ৩৮৫ জন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শামীমা আক্তার লিলি

ফতুল্লা জামা'তে তাহাজ্জুদ নামায ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০৭/২০১১ দিবাগত রাত ফতুল্লা জামা'তে বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নামাযে সর্বমোট ১৭জন উপস্থিত ছিলেন। বাদ ফজর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষে এক বিশেষ ওয়াকারে আমলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে মসজিদ নূর ও কমপ্লেক্সের চার পাশ পরিস্কার করা হয়েছে।

উক্ত ওয়াকারে আমলে আনসার, খোদ্দাম ও আতফালসহ মোট ১৫ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী কাজ করা হয়। এরপর কেন্দ্র হতে আগত ৮/১০ জন খোদ্দামের সহযোগিতায় অত্র কমপ্লেক্সে ১৭টি বিভিন্ন প্রকৃতির গাছ লাগানো হয়। দোয়ার মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ শেষ হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আহমদনগর লাজনা ইমাইল্লাহর খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৭/২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে জনাব সহিদ আহমদ-এর বাড়ীতে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমাতুস সামী। আহাদনামা পাঠ ও দোয়া করান বিলকিস তাহের (প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর)। হাদীস পাঠ করেন রজনী দাউদ। নযম পেশ করেন কুররাতুল আইন। এরপর খিলাফত জুবুলীর দোয়া ও খিলাফত জুবুলীর অঙ্গীকারনামা পাঠ করে শোনান মিলা পাটোয়ারী। খিলাফতের কল্যাণ ও আনুগত্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন কররাতুল আইন। খিলাফত মহা বরকতপূর্ণ বিষয় এ বিষয়ে বলেন আঁখি মনি।

নযম পাঠ করেন নাসিমা বশির। এরপর খলীফার নেতৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে বলেন স্বপ্না মেহতাব, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির, ইসলামে খিলাফতের আবির্ভাব সম্পর্কে সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্। উক্ত খিলাফত দিবসে ৩৮ জন লাজনা ও ২ জন অ-আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে খিলাফত দিবস সমাপ্ত হয়।

মিলা পাটোয়ারী

ঢাকা লাজনা ইমাইল্লাহর তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেহলা সুরাইয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাদেকা হক, নায়েব সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন সুফিয়া বকর। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। হাদীস হতে পাঠ করে শুনান শামস্ আরা।

"সাদাকাতে মসীহ্" বিষয়ে বক্তৃতা করেন ফাতেমা নুসরাত। নযম পরিবেশন করেন খাদিজা রহমান অনন্যা ও সুমিয়া। এরপর খালেদা নাজমুল "আহমদীয়াত বিশ্বকে কি দিয়েছে"? বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রশ্ন উত্তর পর্বে জেরে তবলীগ বোনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সাদেকা হক এবং রওশান জাহান।

অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের মাঝে জামা'তের বই বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬৬ জন লাজনা ৫ জন জেরে তবলীগ এবং ৪ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সালমা আহমদ

নাসেরাতুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১ ও ২ জুলাই, দুই দিনব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস নাসেরাতুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসে নিয়মিত নামায আদায়, প্রভাতে কুরআন পাঠ, আহমদী মেয়েরা কেমন হওয়া উচিৎ, সত্যবাদি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা ও পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রথম দিনের ক্লাসে ক্বাসীদা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে ৩৯ জন নাসেরাত ৫ জন শিশু এবং ৩০ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

কিশওয়ার হাসিন দিশা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমরা সকল পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

সম্পাদক

শুভ বিবাহ

* গত ১১/০৫/২০১১ তারিখ মোছা: মাকসুমা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ ইউনুছ আলী ঢালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে জি, এম, আবু সুফিয়ান, পিতা-মোহাম্মদ নওশের আলী গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ২৫,০০১/- (পঁচিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০৫/১১

* গত ১৯/১১/২০১০ তারিখ মোছা: বুবলি আক্তার, পিতা-মৃত: বজলুর খান, গ্রাম ঘটমাঝি, জেলা মাদারীপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম পিতা-মৃত: আব্দুস সামাদ, খালিশপুর, খুলনা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০৬/১১

* গত ২৮/০৫/২০১১ তারিখ মোছা: মৌসুমী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, হাতিবান্দা, গাবতলী, বগুড়া-এর সাথে আব্দুল মোমিন, পিতা-খোকা প্রামানিক, নিউসোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০৭/১১

* গত ২৭/০৫/২০১১ তারিখ মোছা: সুরাইয়া সালমুন, পিতা-মমতাজ হোসেন মাষ্টার, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে জনাব সাব্বির আহমদ, পিতা-মৃত: বশির আহমদ, কোনাপাড়া, ডেমরা-এর বিবাহ ২,৪০,০০০/- (দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০৮/১১

* গত ২০/০৫/২০১১ তারিখ মোছা: নাজমুন নাহার (স্বপ্না), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, দক্ষিণ শ্রীপুর, তালপট্টি, আশুলিয়া-এর সাথে ইনামউর রহমান, পিতা-আতাউর রহমান, বাসা নং ৩৫০ ব্লক 'ধ' কালশী রোড, মিরপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০৯/১১

* গত ০৬/০৫/২০১১ তারিখ মোছা: জেসমিন বেগম, পিতা-হরমুজ আলী, পূর্ব বাদে. পো: পৈল, জেলা হবিগঞ্জ-এর সাথে জনাব হোসেন আহমদ, পিতা-ডা: আব্দুর রাজ্জাক, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯১০/১১

সত্য উন্মোচিত হচ্ছে -
হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত নেই, তিনি মারা গিয়েছেন [কালের কণ্ঠ]

[বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত পুস্তক মসীহ্ হিন্দুস্তাঁন মেঁ]

কালের কণ্ঠ ১৭
২৩/০৮/২০১১

পবিত্র কোরআনের আলো

জগদ্বাসীর জন্য হজরত ঈসা (আ.) মুক্তি কামনা করলেন যেভাবে

১১৭. মা ক্বলতু লাহুম্ ইল্লা মা আমারতানী বিহী আনি'বুদুল্লাহা রাব্বী ওয়া রাব্বাকুম; ওয়া কুনতু আ'লাইহিম শাহীদাম্ মা দুমতু ফীহিম; ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী কুনতা আনতার্ রাক্বীবা আ'লাইহিম; ওয়া আনতা আ'লা- কুল্লি শাইয়িন শাহীদ।
১১৮. ইন তুআ'যযিবহুম ফাইন্নাহুম ই'বা-দুক; ওয়া ইন তাগফির্ লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আ'যীযুল হাকীম।
১১৯. ক্বালাল্লাহু হা-যা ইয়ানফাউ'স্ সাদিক্বীনা সিদক্বুহুম; লাহুম জান্নাতুন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদীনা ফীহা আবাদা; রাদ্বিইয়াল্লাহু আ'নহুম ওয়া রাদ্বূ আ'নহু; যালিকাল ফাওযুল আ'যীম।
১২০. লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মা ফীহিন্না; ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। [সুরা : আল মায়েদা, আয়াত : ১১৭-১২০]

অনুবাদ : ১১৭. তুমি আমাকে যা কিছু বলতে নির্দেশ দিয়েছ, আমি তো সেগুলো ছাড়া আর কিছুই বলিনি। (আমি বলেছিলাম) তোমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার এবং তোমাদের সবার প্রভু। আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন তো আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে 'ওফাত' দান করলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের তত্ত্বাবধানকারী। আর তুমিই তো সব বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী।
১১৮. ঈসা বললেন, তুমি যদি চাও তাদের শাস্তি দিতে পার, কারণ এরা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি এদের ক্ষমা করে দাও, তাও পার, তুমি তো মহা ক্ষমতাশালী ও প্রজ্ঞাময়।
১১৯. আল্লাহ বললেন, এ হচ্ছে সেই দিন—সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য সুফল পাবে। আর তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে—এ হচ্ছে এক মহা সাফল্য।
১২০. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছু, জগতে যা কিছু আছে এ সব কিছুর মালিকানা তাঁর, আর তিনি সব কিছুতেই সক্ষম।

ব্যাখ্যা : এই আয়াতগুলো সুরা মায়িদার উপসংহার। এই সুরায় খ্রিস্টানদের ভ্রান্তিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে খ্রিস্টানদের একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস ও আকিদাগুলো সংশোধন করার অনেক দিকনির্দেশনা এই সুরায় দেওয়া হয়েছে। ১১৭ ও ১১৮ নম্বর আয়াতে ঈসা (আ.)-এর জবানিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সেসব কথা, যেগুলো একত্ববাদের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার জন্য তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ঈসা (আ.)-এর সেই মহান শিক্ষা গ্রহণ করেছে খুব কম লোকই। ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইহুদি বংশে। কিন্তু ইহুদিরা নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও মূর্খতার কারণে তাঁর নবুয়ত স্বীকার করতে চায়নি এবং তাঁর শিক্ষাও গ্রহণ করতে চায়নি। অপরদিকে ইহুদি সম্প্রদায়ের বাইরে যেসব লোক ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা খুব দ্রুতই একত্ববাদ থেকে সরে গিয়ে খোদ ঈসা (আ.)-কে এবং তাঁর মাকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করাতে শুরু করে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা যে তিনি করেছেন, এ কথা নিজের জবানিতেই তিনি বলছেন। এরপর তিনি বলছেন, যত দিন তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন, অর্থাৎ জীবিত ছিলেন তত দিন তো তিনি তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তো আর তিনি কিছু জানেন না। তখন তারা কী করেছে তা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। এরপর ১১৯ নম্বর আয়াতে এসেছে ঈসা (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনার প্রসঙ্গ। তাঁর নিজের ইহুদি বংশ এবং সমকালের সমাজ ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে অত্যন্ত অবিচার ও নির্মম আচরণ করেছিল। তবে ঈসা (আ.) নিজে তাদের জন্য ও জগদ্বাসীর জন্য করেছেন ক্ষমা প্রার্থনা। নবী ঈসা (আ.)-এর মহান চরিত্রের কথাই এখানে উঠে এসেছে। এরপর ১১৯ ও ১২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজের জবানিতে বলেছেন সত্যবাদী ও সৎ লোকদের জন্য তাঁর কাছে সংরক্ষিত পুরস্কার, নিয়ামতের কথা। ১২০ নম্বর আয়াতে রাজত্বের কথা বলা হয়েছে। রাজত্ব বা ক্ষমতা পরম অর্থে একমাত্র আল্লাহর হাতে। তবে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে রাজত্ব দান করেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ.)-এর পর দীর্ঘদিন রাজত্বের বাইরে ছিল। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর অন্তত ২০০ বছর পর খ্রিস্টানরা রাজত্বের অধিকারী হয়। এরপর তাদের রাজত্বের উত্থান-পতনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সুরার সর্বশেষ আয়াতটিতে এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ্রন্থনা : মাওলানা হোসেন আলী

পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 4th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31 August, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

তৃতীয় শাখা এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com